সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৭ বর্ষ | সংখ্যা: ১৩-১৪
০৫ জানুয়ারি ২০২৬, সোমবার

জামিয়া সালাফিয়া,
ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান

সাপ্তাহিক
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক
রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

مجلة عرفات الأسبوعية
تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش
٩٨. نواب فور، داكا-١١٠٠
الهاتف: ٠٢٧٥٤٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)
الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة
الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)
الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:
الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)
رئيس التحرير:الأستاذ/محمد أسد الإسلام

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

বাংলাদেশ
বার্ষিক : ৭০০ টাকা
ষান্মাসিক : ৩৫০ টাকা

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

২০০৭ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্ন হজ্জ ও ওমরা সেবায়
বিশ্বস্ত একটি নাম আমরা আছি আপনার পাশে

২০২৬ সালের
হজ্জ
বুকিং চলছে

- সহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে হজ্জের সফরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- হজ্জ ফ্লাইট চালুর প্রথম ২/৩ দিনের মধ্যেই ফ্লাইট প্রদানের নিশ্চয়তা।
- সহীহ সুন্নাহভিত্তিক পূর্ণ হজ্জ কার্যক্রম পরিচালনা।
- হজ্জ সফরে একাধিক অভিজ্ঞ আলেমের সরাসরি তত্ত্বাবধানে মাসআলা প্রদান।

সালামত হজ্জ ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস
সরকার অনুমোদিত হজ্জ ওমরা ও ট্রাভেলস এজেন্ট
হজ্জ লাইসেন্স নং: ১১৫৫
সত্বাধিকারী: মোঃ আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী
ATAB
যেকোন প্রয়োজনে কল করুন
01713 495348
অফিস: সুইট ৩০৫/বি, ৪৮ এবি, পুরানা পল্টন
বাইতুল খায়ের (৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০

The weekly Arafat
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক
ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭
রেজি. ডি.এ. ৬০
বর্ষ ৬৭
সোমবার

১৩-১৪ সংখ্যা
০৫ জানুয়ারি-২০২৬ ঈসায়ী
২১ পৌষ-১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৫ রজব-১৪৪৭ হিজরি

প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
অধ্যাপক আহমদ আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী

সার্কুলেশন ম্যানেজার : ডা. সুলতান আহমদ

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম
বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম

সূচিপত্র

মণির খনি ০২
সম্পাদকীয় ০৩
দারসুল কুরআন : মহান প্রভুর প্রথম প্রত্যাদেশ- "পড়ো" — আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
দারসুল হাদীস : জান্নাতীদের তিনটি বৈশিষ্ট্য — গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৭
ইসলামী প্রবন্ধ : সূরাতুল ফাতিহার বৈজ্ঞানিক তাফসীর : প্রসঙ্গ সূরার নামসমূহ — প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী- ১১
উত্তম মৃত্যুর কিছু আলামত ও আমাদের করণীয় — কে. এম আব্দুল জলিল- ১৫
সলাত অমান্য ও অবহেলাকারীর পরিণাম — হাফেয মুহাম্মদ আইয়ূব- ১৯
সাহাবাচরিত : সাহাবী বিলাল ইবনু রাবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) : ঈমান ও মানবিক মর্যাদার প্রতীক — আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী- ২৪
ক্বাসাসুল কুরআন : রাসূল (ﷺ)-এর এক বিস্ময়কর ভ্রমণ — আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৬
অনুবাদ সাহিত্য : যুবকদের ইসলামী শিক্ষা ও লালন-পালন — মূল : ড. আব্দুর রহমান বাল্লাহ আলী, ভাষান্তরে– আব্দুল্লাহীল হাদী- ২৮
মহিলা জগত : কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জান্নাতী নারীর গুণাবলী — ছালেহা বেগম- ৩০
বিস্ময়কর মি'রাজ : আসমানি সফর : সুন্নাহর অনুসরণ ও বিদ'আত পরিহার — আরাফাত ডেস্ক- ৩১
তথ্য-প্রযুক্তি ৩৫
পত্রিকার পাতা থেকে ৩৬
জমঈয়ত সংবাদ ৩৭
ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৩৯
প্রচ্ছদ পরিচিতি ৪৭

সার্বিক যোগাযোগ: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭, বিপণন কর্মকর্তা: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭,
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১, weeklyarafat@gmail.com, www.weeklyarafat.com,
www.jamiyat.org.bd.com, Page: f/shaptahikArafat,f/groups/weeklyarafat

মণির খনি

০১. আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার বাণী : "আর তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহর সাথে (কাউকেও) সদৃশ্য স্থাপন করো না।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ্ ২ : ২১)*

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সহীয়ান, গরীয়ান মহান আল্লাহর মুকাবিলায় অন্যান্য মা'বূদ স্থাপন করাই শির্ক। রাত্রির অন্ধকারে কালো পাথরের ওপর নিঃশব্দে পিঁপড়ার চলাচলের চাইতেও সুক্ষ্ম পর্যায়ে শির্ক সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়। আর যদি তুমি বলো, মহান আল্লাহর কসম এবং ওগো অমুক! তোমার জিন্দেগী ও আমার জিন্দেগীর কসম! আর তুমি বলো, যদি এই ছোট কুকুরটি না থাকত তাহলে আমাদের ঘরে চোর ঢুকত এবং যদি হাঁস না থাকত তবে চোর আসত। কোনো ব্যক্তির নিজ বন্দুকে বলা, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেছেন এবং তুমি যা ইচ্ছা করেছ। আর কোনো ব্যক্তির এই কথা বলা আল্লাহ এবং অমুক না থাকলে। মহান আল্লাহর সঙ্গে 'অমুক'কে স্থাপন করো না। এ সবই মহান আল্লাহর সঙ্গে শরীক করার শামিল। *(কিতাবুত তাওহীদ)*

০২. প্রিয় রাসূল (ﷺ) বলেছেন : আমি তোমাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বড় আশঙ্কা যা পোষণ করি তা হচ্ছে ছোট শির্ক। ছোট শির্ক কি? একথা তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ওটা হচ্ছে রিয়া বা লোক দেখানো নেক 'আমল। *(কিতাবুত তাওহীদ)*

০৩. সবচেয়ে নিকৃষ্ট শির্ক মহান আল্লাহর সত্ত্বায় দোষ সংযুক্ত করা। *(কিতাবুত তাওহীদ)*

০৪. বিনা দলিলে আলেম-দরবেশদের ফাতাওয়া মেনে নেয়া *(সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩১)* এবং তাকলীদ করা শির্ক। *(কিতাবুত তাওহীদ)*

০৫. আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার বাণী : "পীর, ওলী, দরবেশ –এদের প্রতি আল্লাহর ন্যায় ভালোবাসা পোষণ করা –এটা শির্কের পর্যায়ভুক্ত।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ্ ২ : ১৬৪)*

০৬. আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার বাণী : "কারো প্রতি এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, সে ইচ্ছা করলে সে কোনো ভালো বা মন্দ করতে পারে –এটা শির্কের শামিল।" *(সূরা আয্-যুমার ৩৯ : ৩৮)*

০৭. রোগ প্রতিরোধের জন্য বালা পরিধান করা, তাবিজ বা ঝিনুক জাতীয় ঘুঙুর ঝুলানো এবং তাগা পরিধান করা –এগুলো শির্কের পর্যায়ভুক্ত। *(কিতাবুত তাওহীদ)*

০৮. যে স্থানে গাইরুল্লাহর নামে পশু (যবেহ) হয়, সেখানে মহান আল্লাহর ওয়াস্তে (পশু) যবেহ করা হয়। *(কিতাবুত তাওহীদ)*

০৯. কোনো স্থানে যদি জাহেলী যুগের কোনো প্রতিমা ছিল বলে প্রতীয়মান হয় (অবশ্য বর্তমানে সেখানে কোনো প্রতিমা না থাকলেও) সেখানে কোনো কিছু মান্নত করা। *(কিতাবুত তাওহীদ)*

১০. মুশরিকদের মেলার স্থানে (যদিও বর্তমানে তার কোনো অস্তিত্ব নেই) কোনো কিছু মান্নত করা। *(কিতাবুত তাওহীদ)*

১১. মান্নত মহান আল্লাহর নামে সাব্যস্ত হওয়ার পর তাকে গাইরুল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া। *(কিতাবুত তাওহীদ)*

১১. রাসূল (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোনো স্থানে অবতরণ করে (পৌঁছে) বলে আমি মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যগুলো দ্বারা তাঁর সমগ্র সৃষ্টির অমঙ্গল হতে (তাঁর নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করছি তবে তাকে কোনোকিছুই ক্ষতি করতে পারে না যতক্ষণ না সে সেখান থেকে গাত্রোত্থান করে। *(সহীহ মুসলিম)*

১২. গাইরুল্লাহর সাহায্য চাওয়া এবং সৃষ্টবস্তুর মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া। *(কিতাবুত তাওহীদ)*

সম্পাদকীয়

ইসরা ও মি'রাজ : মহান আল্লাহর কুদরতে বিস্মিত বিজ্ঞান

রজব মাস চলমান। ভিন্ন মত থাকলেও প্রসিদ্ধ মতে এ মাসেই ঘটেছিল ইসরা ও মি'রাজ। এ ছিল স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সাক্ষাতের অভূতপূর্ব ঘটনা। বিশ্বনবী (ﷺ)-র ব্যথিত চিত্ত নতুন প্রেরণায় হয়েছিল উজ্জীবিত। কিন্তু কাফির-মুশরিকদের কাছে এ ছিল এক অচিন্তনীয় বিষয়। মাটির মানুষ মহাকাশ পেরিয়ে আরশের দেশে! তাও আবার রাতের সামান্য অংশে! সময়ের সীমায় এ তো অসম্ভব! আধুনিক বিজ্ঞান আজ নিজেই বিস্মিত। এতদূর পথ! নেই দৃশ্যমান আধুনিক মহাকাশ যান। রকেট বা অনুরূপ দ্রুতগামী কোনো কিছু। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির শক্ত বাঁধাও পরাভূত! মঙ্গল গ্রহ কিংবা চাঁদে যেতেই এই আধুনিক যুগে কত আয়োজন আর প্রটেকশনের প্রয়োজন পড়ে! তারপরও নানা জটিলতা আর অনিশ্চয়তায় ভেস্তে যেতে পারে বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার বাজেটের মহাআয়োজন। অথচ বিজ্ঞান-চর্চায় পিছিয়ে থাকা সেই যুগে আরবের মুহাম্মদ (ﷺ) শুধু মহাকাশ নয়, তারও অ-নে-ক উপরে সৃষ্টিকুলের শেষসীমা 'সিদরাতুল মুন্তাহা' পেরিয়ে ঘুরে আসলেন সশরীরে। মহান আল্লাহর সাথে কথা বললেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উপহার নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন পুরোপুরি নিরাপদে। অকল্পনীয় স্বল্পতম সময়ে। কাজেই কাফিরদের মনোজগতে ঝড় তো ওঠবেই। কিন্তু না, সন্দেহের সুযোগ নেই। অবিশ্বাসীদের বিশ্বাসের ভিত নড়েচড়ে গেলেও মু'মিনদের কাছে এটা সন্দেহ করার মতো কোনো বিষয়ই নয়। কারণ বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের অসংখ্য কুদরতের মাঝে ইসরা এবং মি'রাজও অন্যতম বিস্ময়কর বাস্তবতা।

'ইসরা' হলো রাত্রিকালীন ভ্রমণ, আর 'মি'রাজ' অর্থ সিঁড়ি। মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সফরের অংশ হিসেবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রবিউস সানী মতান্তরে রজব মাসের ২৬ তারিখ দিবাগত রাতে অর্থাৎ- ২৭ তারিখে রাতের শেষ প্রহরে 'বোরাক' নামক ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন সওয়ারিতে চড়ে স্বল্প সময়ে মক্কা থেকে ফিলিস্তীনের বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। ইসলামী শরীয়তে এ সফরকেই 'ইসরা' বলা হয়। আর আকাশ থেকে নামিয়ে দেয়া সিঁড়ির সাহায্যে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে তিনি ঊর্ধ্ব জগতে যে সফর করেন, তা 'মি'রাজ' নামে পরিচিত। পবিত্র কুরআনে সূরা ইসরা বা বানী ইসরা-ঈলের ১ম আয়াতে 'ইসরা' সম্পর্কে বলা হয়েছে– "পরম পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রির একাংশে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্বসা পর্যন্ত, যার চতুষ্পার্শ্বকে আমরা বরকতময় করেছি, যাতে আমরা তাকে আমাদের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিতে পারি। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"– *(বানী ইসরা-ঈল : ১)*। আর সূরা আন্-নাজম-এর ১৩-১৮, অর্থাৎ- ৬টি আয়াতে 'মি'রাজ' সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

সহীহুল বুখারীর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে শুরু হওয়া 'মি'রাজ' বা ঊর্ধ্ব জগতের সফরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রথম আকাশে আদম (আলাইহিস সালাম), দ্বিতীয় আকাশে 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) ও ইয়াহইয়া (আলাইহিস সালাম), তৃতীয় আকাশে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম), চতুর্থ আকাশে ইদ্‌রীস (আলাইহিস সালাম), পঞ্চম আকাশে হারুন (আলাইহিস সালাম), ষষ্ঠ আকাশে মূসা (আলাইহিস সালাম) এবং সপ্তম আকাশে ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। জান্নাত, জাহান্নাম, সিদরাতুল মুনতাহা ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন করেন। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, সফরের শুরুতে কিংবা শেষে নবী (আলাইহিস সালাম)-দের নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে দু'রাক'আত সলাতে ইমামতি করেন। মক্কা থেকে সফরের শুরুতে তাঁর 'সাক্কুস সদর' বক্ষ বিদারণ করা হয় মর্মেও বর্ণনা রয়েছে।

হিজরতের আগের বছরে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়। প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবং বিপদ আশ্রয়দাতা, শৈশবে লালন-পালনকারী চাচা আবূ তালিবের মৃত্যুতে বিশ্বনবী (ﷺ) বেশ মর্মাহত হন। ইসলাম গ্রহণে অনিচ্ছুক তায়েফবাসীর নির্মমতাও হৃদয়বিদারক। এ প্রেক্ষিতে 'ইসরা' এবং 'মি'রাজ' বিশ্বনবী (ﷺ)-এর আত্মিক প্রশান্তি এবং মানসিক শক্তি অর্জনের জন্য বড় ভূমিকা পালন করেছে। আর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য নিঃসন্দেহে এক বড় উপহার। মহান আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক গড়ার এক অব্যর্থ মাধ্যম। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন আমাদের জীবনে 'মি'রাজ'-এর শিক্ষা বাস্তবায়নের তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

🕮 দারসুল কুরআন :

মহান প্রভুর প্রথম প্রত্যাদেশ- “পড়ো”

আবূ সা‘আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ★

আল্লাহ তা‘আলার বাণী

﴿اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ؕ﴾

সরল বাংলায় অনুবাদ

“পড়ো! তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট-বাঁধা রক্তপিণ্ড হতে। তুমি পড়ো, আর তোমার প্রভু বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।”[১]

শাব্দিক অনুবাদ

اِقْرَاْ -(এটি একটি আদেশসূচক শব্দ) অর্থ- (তুমি) পড়ো!, بِاسْمِ -নামের সাহায্যে, رَبِّكَ -তোমার প্রতিপালকের, الَّذِىْ -যিনি, خَلَقَ -(তিনি) সৃষ্টি করেছেন, خَلَقَ الْاِنْسَانَ -সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, مِنْ -হতে বা থেকে, عَلَقٍ -জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড, وَ -এবং, الْاَكْرَمُ -মহিমাময়/সম্মানিত, عَلَّمَ -(তিনি) শিক্ষা দিয়েছেন, بِالْقَلَمِ -কলমের মাধ্যমে/কলমের সাহায্যে, عَلَّمَ الْاِنْسَانَ -(তিনি) মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, مَا -যা, لَمْ يَعْلَمْ -সে জানত না।

সূরা ও আয়াত পরিচিতি

দরসে উল্লেখিত আয়াত পাঁচটি কুরআনুল কারীমের ৯৬ নং সূরা– সূরা আল-‘আলাক্ব থেকে নেওয়া হয়েছে। এগুলো সূরা আল-‘আলাক্ব-এর প্রথম পাঁচ আয়াত। এ সূরায় মোট ১৯টি আয়াত রয়েছে। এ সূরায় ৭২টি শব্দ এবং ২৮১টি বর্ণ রয়েছে। এ সূরায় একটি রুকূ‘ ও একটি সিজদাহ্ রয়েছে।

নামকরণ

এই সূরার নাম সূরা আল-‘আলাক্ব। আরবি ভাষায় اَلْعَلَقُ শব্দের অর্থ হলো- রক্তপিণ্ড, ঝুলে থাকা বস্তু, জমাট বাঁধা রক্ত ইত্যাদি। সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত ‘আলাক্ব عَلَقٍ শব্দ থেকে এর নাম করণ করা হয়েছে।

অবতরণের সময়কাল

সূরা আল-‘আলাক্ব-এর এ আয়াতগুলো নবুওয়াতের একেবারে শুরুতে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। তাই এ সূরাটি মক্কী সূরা হিসেবে পরিগণিত। নুযূলে ওয়াহী-র বছরে রবীউল আউয়াল মাস থেকে রাসূল (ﷺ) সত্যস্বপ্ন দেখতে থাকেন। ছ’মাস পর রমাযান মাসে তিনি হেরা গুহাতে ই‘তিকাফ করেন। অতঃপর শেষ দশকে ক্বদর রাতে কুরআন নাযিলের সূচনা হয়। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, সূরা আল-‘আলাক্ব থেকেই নবী (ﷺ)-এর ওপর ওয়াহীর সূচনা হয় এবং এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত সর্ব প্রথম নাযিল হয়। কেউ কেউ সূরা আল-মুদ্দাস্সিরকে প্রথম সূরা এবং কেউ কেউ সূরা আল-ফাতিহাহ্কে সর্বপ্রথম সূরা বলে অভিহিত করেছেন। তবে প্রথমোক্ত মতটিই বিশুদ্ধ।[২]

আলোচ্য বিষয়

দারসে উল্লেখিত আয়াতগুলোতে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টি কৌশল বর্ণনাসহ পড়া-লেখার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের কৌশল শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে মানুষের উপর আল্লাহ তা‘আলা যে বিরাট অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন তার একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

আল্লাহ তা‘আলার বাণী :

﴿اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ﴾

অর্থ : “পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।”

আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা সকলের পালনকর্তা হলেও আলোচ্য আয়াতে ‘তোমার প্রভু’ বলে রাসূল (ﷺ)-কে খাস করার মাধ্যমে তাঁর মর্যাদাকে উচ্চ শিখরে উন্নীত করা

★ *এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা আল-‘আলাক্ব : ১-৫।*

[২] *বুখারী- হা. ৬৯৮২; আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন- ১/৯৩।*

হয়েছে। অতঃপর 'যিনি সৃষ্টি করেছেন' বলে সৃষ্টির বিষয়টি সকল সৃষ্টিকুলের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। আর সর্বপ্রথম 'পড়ো' বলে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা লেখা-পড়া তথা জ্ঞান অর্জন করার গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। এ আয়াতটিসহ পরপর পাঁচটি আয়াত মানবজাতির জন্য সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে শেষনবী (ﷺ)-এর নিকটে প্রেরিত সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশ। এটাই শেষ যামানার মানুষের নিকট মহান আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত সর্বপ্রথম আসমানী বার্তা। এটা ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন তিনি হেরা গুহায় মহান আল্লাহর 'ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। জিবরা-ঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁর নিকট এসে বললেন, 'পড়ো।' তিনি বললেন, 'আমি পড়তে জানি না।' জিবরা-ঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে জড়িয়ে শক্তভাবে চেপে ধরলেন এবং বললেন, 'পড়ো।' তিনি পুনর্বার একই উত্তর দিলেন। এইভাবে জিবরা-ঈল (আলাইহিস সালাম) তিনবার করলেন। এরপর তিনি পড়তে শুরু করলেন। ইমাম ইবনু কাসীর বলেন, এগুলো ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার উপরে প্রথম রহমত এবং তাদের উপরে মহান আল্লাহর প্রথম নিয়ামত (তাফসীর ইবনু কাসীর) ইমাম কুরতুবী বলেন, এখানে পড়ার বিষয়টি উহ্য রাখা হয়েছে। যার অর্থ "কুরআন" অর্থাৎ- কুরআন পড়ো এবং বিস্‌মিল্লা-হ বলে শুরু করো।[৩] আলোচ্য আয়াতে শুধু বলা হয়েছে "তিনি সৃষ্টি করেছেন" কিন্তু কাকে সৃষ্টি করেছেন তা বলা হয়নি। এ থেকে আপনা-আপনিই এ অর্থ বের হয়ে আসে যে, সেই রবের নাম নিয়ে পড়ো যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা, স্রষ্টা সমগ্র সৃষ্টিজগতের।[৪]

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾

"তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট-বাঁধা রক্তপিণ্ড হতে।"

পূর্বের আয়াতে সমগ্র সৃষ্টিজগত সৃষ্টির বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সৃষ্টিজগতের মধ্য থেকে বিশেষ করে মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে মানুষের মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এরপর মহান আল্লাহর বাণী, মানুষকে তিনি 'আলাক্ব' থেকে সৃষ্টি করেছেন। 'আলাক্ব' হচ্ছে 'আলাক্বাহ্' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ জমাট বাঁধা রক্ত, সংযুক্ত, ঝুলন্ত ইত্যাদি। সাধারণত মুফাস্‌সিরগণ এর অর্থ করেছেন জমাট রক্ত। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান মতে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের যে ক্রমবিকাশ হয়, তাতে প্রথম দিকে পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিম্বানু মিলিত হয়ে জরায়ুর গায়ে সংযুক্ত হয়ে থাকে। এ হিসেবে 'আলাক্ব' হলো সম্মিলিতরূপে শুক্র ও ডিম্বানুর জরায়ু-সংলগ্ন সেই অবস্থানের নাম, যা আলাক্ব-এর আভিধানিক অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টির কথা বলার পর বিশেষ করে মানুষ্য সৃষ্টির কথা বলে আল্লাহ তা'আলা কেমন হীন অবস্থা থেকে তার সৃষ্টিপর্ব শুরু করে তাকে পূর্ণাংগ মানুষে রূপান্তরিত করেছেন, তার বিবরণ দিয়েছেন।[৫] এ বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বিশদ বিবরণ দিয়েছে সূরা আল-হাজ্জ-এর পাঁচ নম্বর আয়াতে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

﴿ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ؕ وَ نُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْۤا اَشُدَّكُمْ ۚ وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا﴾

অর্থ : "শুক্র থেকে, তারপর আলাক্বা থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট অথবা অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট গোশ্‌ত থেকে। তোমাদের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করার নিমিত্তে। আর আমি যা ইচ্ছা করি তা একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত মাতৃগর্ভে অবস্থিত রাখি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা যৌবনে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু দেয়া হয় এ বয়সেই, আবার কাউকে কাউকে ফিরিয়ে নেয়া হয় হীনতম বয়সে, যাতে সে জ্ঞান লাভের পরও কিছু না জানে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ﴾

অর্থ : "তুমি পড়ো, আর তোমার প্রভু বড়ই অনুগ্রহশীল।"

এখানে প্রথম আয়াতে বর্ণিত اِقْرَاْ থেকে পুনরায় তাকীদস্বরূপ اِقْرَاْ এসেছে অর্থ- তুমি পড়ো। এর দ্বারা বড় অলঙ্কারপূর্ণ ভঙ্গিমায় নবী (ﷺ)-এর ওযরের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যা তিনি 'আমি পড়তে জানি না' বলে পেশ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, প্রথম আদেশটি নিজে পাঠ করার আদেশ, আর দ্বিতীয়টি অন্যকে পাঠ করানো বা অন্যের নিকট প্রচারের নির্দেশ।[৬] এরপর মহানপ্রভু তাঁর

[৩] *তাফসীরে কুরতুবী।*
[৪] *আদওয়াউল বায়ান।*
[৫] *তাফসীর কুরতুবী।*
[৬] *ফাতহুল কাদীর।*

সাথে الْأَكْرَمُ বিশেষণ যোগ করার মাধ্যমে এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, মানুষ সৃষ্টি করে তাদের শিক্ষাদান করার নিয়ামতের মধ্যে তাঁর নিজের কোনো স্বার্থ ও লাভ নেই; বরং এগুলো তাঁরই অনুগ্রহ, তাঁরই দান। তিনি সর্বমহান দানশীল ও মহামহিমান্বিত।[৭] কেউ কেউ আবার মনে করেন, এখানে প্রথম আয়াতটি মহান আল্লাহর রুবূবিয়াতের সাথে সম্পৃক্ত এবং অত্র আয়াতটি তাঁর প্রেরিত শরী'আতের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা তার পরের আয়াতে কলম দিয়ে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে আর এ কথা সকলেরই জানা যে, কুরআন-হাদীস লিখিত ও সংরক্ষিত হয়েছে কলমের সাহায্যে। ওয়াহী নাযিলের শুরুতেই বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর এই ধরনের বার বার পড়ার নির্দেশ বিগত কোনো আসমানী গ্রন্থে ছিল বলে জানা যায় না। আমাদেরকে বারংবার 'পড়ো' বলে তাকীদ দিয়েছেন কারণ তিনি চান আমরা যেন তাঁর সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করি এবং সচেতনভাবে তাওহীদের সাক্ষ্য দেই। অতঃপর ভক্তিভরে তাঁর 'ইবাদত করি। الْأَكْرَمُ অর্থ كريم দয়ালু। অথবা حليم অর্থ-ধৈর্য। যিনি বান্দার অজ্ঞতা ও মূর্খতায় ধৈর্য ধারণ করেন ও শাস্তি দিতে দেরি করেন। তবে কুরতুবী বলেন, প্রথমটাই অর্থের সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ[৮]। এখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড় দায়ালু। কারণ তিনি মু'মিন-কাফির সবাইকে আলো-বাতাস ও খাদ্য-পানীয় দিয়ে উদারভাবে প্রতিপালন করে থাকেন। **দ্বিতীয়তঃ** তিনি বান্দাকে জ্ঞানরূপী মহা নিয়ামত দান করেছেন। যার ফলে সে মূর্খতার অন্ধকার হতে মুক্তি পেয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾

অর্থ : "যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।"

قَلَم অর্থ হলো– কাটা, চাঁছা বা ছিলা। পূর্ব যুগের লোকেরা কেটে বা চেঁছে কলম তৈরি করত। এই জন্য লেখার যন্ত্রকে কলম বলা হয়। মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি মানুষকে কলমের মাধ্যমে তথা লেখার মাধ্যমে জ্ঞান সংরক্ষনেরর ব্যবস্থা করেছেন এবং লেখা ও পড়ার মাধ্যমে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেছেন। তা না হলে মানুষের মধ্যে জ্ঞানের উন্নতি, বংশানুক্রমিক ক্রমবিকাশ সম্ভব হত না। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পূর্ববর্তীদের জীবন-কাহিনী, আসমানী-কিতাব সব কিছুই সংরক্ষিত হয়েছে লেখনির মাধ্যমে। কলম না থাকলে দ্বীন এবং দুনিয়ার কোনো কিছুই পূর্ণরূপে গড়ে উঠত না।[৯] হাদীসে এসেছে– আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সে মতে কলম কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে।[১০]

আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

অর্থ : "তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।"

এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা আল্লাহ। মানুষ আসলে ছিল সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। তার যা জ্ঞান মহান আল্লাহর কাছ থেকেই সে তা লাভ করেছে।[১১] পূর্বের আয়াতে কলমের সাহায্যে শিক্ষা দানের কথা বলা হয়েছে, এখানে সে শিক্ষা দানের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি এমন সব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা মানুষ জানত না। কেউ কেউ বলেন, এখানে মানুষ বলে আদম (আলাইহিস সালাম)-কে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিভিন্ন বস্তুর নাম ও গুনাগুন শিক্ষা দিয়েছেন। যেমনটি সূরা আল-বাক্বারায় বর্ণনা করা হয়েছে।[১২]

শিক্ষাসমূহ

এক- শিক্ষার বিকল্প নেই। তাই তো আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সৃষ্টির সূচনা করেছেন কলম দিয়ে। সর্বপ্রথম তিনি কলম সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমাদের কাছে ওয়াহীর সূচনা করেছে 'পড়ো' শব্দ দিয়ে। সুতরাং লেখা-পড়ার মাধ্যমে আমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

দুই- মানব সৃষ্টির উপাদান ও পর্যায়গুলোর মধ্যেও মানবজাতির জন্য এক বিশেষ শিক্ষা রয়েছে।

তিন- শুধু পড়ে, মুখস্ত করে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করার নাম শিক্ষা নয়; বরং শিক্ষা হলো পড়া ও লেখার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করা।

চার- প্রকৃত শিক্ষা একমাত্র ওয়াহীর মধ্যেই নিহিত। কেননা, মহান স্রষ্টাই প্রকৃত শিক্ষক এবং তিনিই মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন।

পাঁচ- শিক্ষা হলো অজানাকে জানার নাম।

---

[৭] *আদ্ওয়াউল বায়ান- মুয়াস্সার।*
[৮] *কুরতুবী।*
[৯] *ফাতহুল কাদীর।*
[১০] *মুসনাদে আহমাদ- ৫/৩১৭।*
[১১] *সা'দী।*
[১২] *ফাতহুল কাদীর।*

🕮 দারসুল হাদীস :

জান্নাতীদের তিনটি বৈশিষ্ট্য

গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِيْ قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْ عِيَالٍ.

‘ইয়ায ইবনু হিমার মুজাশিয়ী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আর জান্নাতী হলো তিন প্রকার ব্যক্তি; ন্যায়পরায়ণ দানশীল তাওফীকৃপ্রাপ্ত শাসক, দয়াবান এবং প্রত্যেক আত্মীয় তথা মুসলিমের প্রতি কোমল-হৃদয়। আর (অশ্লীলতা ও যাঞ্চা) থেকে পবিত্র সন্তানবান ব্যক্তি।[১৩]

হাদীসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসে রাসূলে করীম (ﷺ) তিন ধরণের জান্নাতী লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা উল্লেখ করা হলো–

হাদীসের শুরুতে জান্নাতী লোকের কথা বলতে গিয়ে নবীজী (ﷺ) বলেছেন,

ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ.

অর্থাৎ- ন্যায়পরায়ণ দানশীল তাওফীকৃপ্রাপ্ত শাসক।[১৪]

আমরা জানি যে, পৃথিবীকে সুষ্ঠু-সুচারুরূপে পরিচালিত করতে আল্লাহ তা‘আলা সব মানুষকে শাসক ও প্রজা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। নবীজি প্রজাদের ওপর স্বীয় শাসকের ন্যায়নিষ্ঠ আদেশ মান্য করা আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। অন্যদিকে শাসকদের হুকুম দিয়েছেন প্রজাদের প্রতি ন্যায়-ইনসাফের আচরণ করতে; তাদের অধিকার আদায়ে মনোযোগী হতে। জনগণকে অধিকার বঞ্চিত করা ও যুল্‌ম-অত্যাচার করা ইসলামে মহাপাপ হিসেবে স্বীকৃত। শাসকদের দায়িত্ব প্রজা-সাধারণের অধিকারগুলোর প্রতি খেয়াল রাখবে; সেগুলো আদায়ে সচেষ্ট হবে।

‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা নিযুক্ত হলে সা‘ঈদ ইবনু ‘আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ‘হে ‘উমার! আমি আপনাকে মানুষের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। তবে আল্লাহর ব্যাপারে মানুষকে ভয় করবেন না। আর আপনার কথা আপনার কাজের যেন পরিপন্থী না হয়। কারণ কর্ম দ্বারা সত্যায়িত কথাই সর্বোৎকৃষ্ট কথা।’[১৫]

শাসক শ্রেণির দায়িত্ব প্রজাসাধারণের জীবনের নিরাপত্তা দেওয়া। তাদের মৌলিক অধিকার তথা খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তাদের সম্পত্তির হিফাযত করা।

ন্যায়পরায়ণ, দানশীল ও তাওফীকৃপ্রাপ্ত শাসক বলতে এমন একজন নেতাকে বোঝানো হয় যিনি মহান আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতাকে ন্যায়বিচার, দয়া ও জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করেন; যেমন- কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন বা নবী দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর মতো ব্যক্তিত্ব, যিনি জনগণের প্রতি সৎ, সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিত করতে পেরেছিলেন এবং যার দু‘আ কবুল হতো, যিনি আল্লাহকে ভয় করে ইনসাফ করতেন ও দানশীলতার মাধ্যমে আখিরাতের পুরস্কার কামনা করতেন। আলোচ্য হাদীসে শাসকের ব্যাপারে তিনটি কথা বলা হয়েছে–

১. **ন্যায়পরায়ণতা :** আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, যুল্‌ম ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকা।
২. **দানশীলতা :** জনগণের হক্ব আদায় করা এবং তাদের অভাব পূরণ করা।

★ *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[১৩] *ইবনু হিব্বান- হা. ৭৪৫৩।*

[১৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬৩/২৮৬৫।*

[১৫] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা- ১/১৯২।*

৩. তাওফীক্বপ্রাপ্ত : মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত হওয়া, যা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

ন্যায়পরায়ণ শাসকের জন্য রয়েছে আখিরাতে বিশেষ পুরস্কার। কিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনে, যেদিন কেউ কারো কাজে আসবে না, আল্লাহ তা'আলা বিশেষ সাত শ্রেণির মানুষকে তার আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি হবেন ন্যায়পরায়ণ শাসক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ.

'আল্লাহ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তার (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। প্রথমজন হলেন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ।'[১৬]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ (رضي الله عنه) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِيْ حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا.

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মহান আল্লাহর নিকট যারা ন্যায়পরায়ণ তারা দয়াময়ের ডান পার্শ্বে জ্যোতির মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হস্তই ডান। (ঐ ন্যায়পরায়ণ তারা) যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ।'[১৭]

হাদীসে জান্নাতী দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেকে যাকে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি হলেন,

وَرَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِيْ قُرْبَى وَمُسْلِمٍ.

অর্থাৎ- দয়াবান এবং প্রত্যেক আত্মীয় তথা মুসলিমের প্রতি কোমল-হৃদয়।

এটি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যেখানে মানুষজন মহান আল্লাহর সৃষ্টি, বিশেষত আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য মুসলিমদের প্রতি দয়া, মমতা এবং নম্র ব্যবহার করবে।

কোমল হৃদয় মহান আল্লাহর এক বিশেষ দান। কোমল হৃদয়, কোমল মনের অধিকারী ব্যক্তি সামাজিকভাবে অত্যধিক সম্মানের পাত্র হিসাবে পরিগণিত হন। এটি এমন একটি দূর্লভ গুণ, যেটির প্রভাবে ব্যক্তির চরিত্রে আরো কতগুলো সুন্দর ও বিরল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটে। যেমন যিনি কোমল হৃদয়ের অধিকারী, তিনি সাধারণত নম্র-ভদ্র, মিষ্টভাষী, সুন্দর ব্যবহার, মানবিক আচরণ, পরশ্রীপরায়ণ, কল্যাণকামী, সহানুভূতিশীল, দয়ার্দ্র, নির্লোভী, নিরহংকারী ও নিঃস্বার্থবাদী স্বভাবের হয়ে থাকেন।

عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ : «إِنَّ اللهَ تَعَالَى رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِيْ عَلَى مَا سِوَاهُ». وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ : قَالَ لِعَائِشَةَ : «عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شانه.

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা কোমল। তিনি কোমলতাকেই ভালোবাসেন। আর তিনি কঠোরতা এবং অন্য কিছুর কারণে যা দান করেন না তা কোমলতার জন্য দান করেন।[১৮] মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে– একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বললেন। কোমলতা নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও এবং কঠোরতা ও নির্লজ্জতা হতে নিজেকে বেঁচে রাখো। বস্তুতঃ যেই জিনিসে নম্রতা ও কোমলতা থাকে সেটাই তার শ্রীবৃদ্ধির কারণ হয়। আর যেই জিনিস হতে প্রত্যাহার করা হয় এবং তা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে।[১৯]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى النَّبِيِّ (ﷺ) فَقَالُوْا السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ

[১৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৪২৩।*
[১৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪৮২৫।*
[১৮] *সহীহ মুসলিম।*
[১৯] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৫০৬৮।*

وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ قُلْتُ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ.

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ইয়াহূদী নবী (ﷺ)-এর নিকটে প্রবেশের অনুমতি চাইল। (প্রবেশ করার সময়) তারা বলল 'আস্‌সামু 'আলাইকা (তোমার মৃত্যু হোক)। তখন আমি বললাম; বরং তোদের উপর মৃত্যু ও লানত হোক। নবী (ﷺ) বললেন : হে 'আয়িশাহ্! আল্লাহ তা'আলা কোমল। তিনি সকল কাজে কোমলতা পছন্দ করেন। আমি বললাম, আপনি কি শুনেননি তারা কী বলেছে? তিনি বললেন : আমিও তো বলেছি ওয়া-আলাইকুম (এবং তোমাদের উপরও)।[২০]

এই হাদীসটিতে বলা হয়েছে– إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ.

"আল্লাহ তা'আলা দয়ালু।"[২১]

আল্লাহ তা'আলাকে যে رَفِيْقٌ বলা হয়েছে, তা প্রকৃত অর্থে নয়; বরং রূপক অর্থে। বোঝানো উদ্দেশ্য তিনি বান্দার প্রতি দয়ালু ও মমতাবান। তিনি দয়ালু বলেই বান্দার প্রতি অবিরত দয়ার আচরণ করে থাকেন। কারো মতে এর মানে তিনি সহনশীল। তিনি বান্দাকে তড়িঘড়ি করে শাস্তি দেন না। অবকাশ দেন, যাতে সে তাওবাহ্ করে নিজেকে সংশোধন করে ফেলতে পারে অথবা দুর্ভাগা হলে আরো বেশি পাপাচার করে নিজের অশুভ পরিণাম নিশ্চিত করতে পারে।

আল্লাহ সকল বিষয়ে কোমলতা ভালোবাসেন। কোমলতা ভালোবাসেন বলেই তিনি শরীআতের যাবতীয় বিষয়ে লক্ষ রেখেছেন যাতে বান্দার প্রতি তা কঠোর ও কঠিন না হয়ে যায়; বরং সহজে তারা তা পালন করতে পারে। বান্দার প্রতি তাঁর নিজ আচরণ কোমল হওয়ায় তিনি চান বান্দাও অন্যের প্রতি তার যাবতীয় আচার-আচরণে দয়া ও কোমলতা দেখাক। আল্লাহর প্রকৃত বান্দাকে তো তা দেখাতেই হবে। কেননা একজন প্রকৃত বান্দা আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবেসে থাকে। আর সে যখন আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, তখন আল্লাহ যা ভালোবাসেন, সে তো তাই করবে। সুতরাং আল্লাহ যখন কোমলতা ভালোবাসেন, তখন তার তো অবশ্যই কোমল আচরণকারী হতে হবে। বস্তুতঃ কোমলতার উপকার বহুবিধ। সুতরাং হাদীসে বলা হয়েছে–

وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ.

কোমলতায় তিনি দিয়ে থাকেন, যা কঠোরতায় দেন না।[২২]

এর দ্বারা পরস্পরে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় ও শত্রুতা দূর হয়। আপনজনদের মধ্যে কোমল আচরণ দ্বারা ভালোবাসা সুদৃঢ় হয় ও বৃদ্ধি পায়। কোমল আচরণ দ্বারা সামাজিক বন্ধন মজবুত হয়। এর ফলে অনুচর ও অনুসারীগণ নেতার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হয়ে ওঠে আর তখন তারা সে নেতার আদেশ অনেক বেশি আগ্রহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করে থাকে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, একজন কোমল আচরণকারী শিক্ষকের কাছ থেকে তার ছাত্র যত বেশি উপকৃত হতে পারে, কঠোর ও রূঢ় ব্যবহারকারী শিক্ষকের কাছ থেকে ততোটা হতে পারে না। শিক্ষকের কোমল ও মমতাপূর্ণ আচরণের ফলে পড়াশোনায় শিক্ষার্থীর অগ্রগতিও অনেক বেশি হয়। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ﴾

"(হে নবী! এসব ঘটনার পর) আল্লাহর রহমতই ছিল, যদ্দরুন তাদের প্রতি তুমি কোমল আচরণ করেছ। তুমি যদি রূঢ় প্রকৃতির ও কঠোর হৃদয় হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত।"[২৩]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন,

مَنْ لَّا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.

'যে ব্যক্তি দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।"[২৪]

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন,

[২০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৯২৭।*
[২১] *সহীহ মুসলিম- হা. ৭৭/২৫৯৩।*
[২২] *সহীহ মুসলিম- হা. ৭৭/২৫৯৩।*
[২৩] *সূরা আ-লি-'ইমরান : ১৫৯।*
[২৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৯৭; সহীহ মুসলিম- হা. ২৩১৮; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪৬৭৮।*

اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

'দয়াশীলদের উপর পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা দয়া করেন। তোমরা যমীনবাসীকে দয়া করো, তাহলে আসমানবাসী আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দয়া করবেন।'[২৫]

হাদীসে জান্নাতী দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেকে যাকে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি হলেন,

وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْ عِيَالٍ.

আর (অশ্লীলতা ও যাঞ্চা) থেকে পবিত্র সন্তানবান ব্যক্তি।[২৬]

নিজে অশালীন হওয়া আভিজাত্যের প্রতীক নয়। নোংরামি সভ্যতা নয়। গুনাহের কাজ কখনো সুস্থ সভ্যতা হতে পারে না। সভ্য হতে হলে গুনাহের কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও অবাধ যৌনতা সুস্থ সভ্যতা নয়। কেননা, যদি কোনো ব্যক্তি আগুনের কাছে যায়, তাহলে তার আগুনের তাপে দগ্ধ হওয়ার ভয় থাকে। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি যদি কুয়ার কিনারায় দাঁড়ায়, তাহলে তার কুয়ার অভ্যন্তরে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ঠিক তেমনিভাবে কোনো ব্যক্তি যদি অশ্লীলতার উপায় উপকরণের কাছে যায়, তাহলে তার অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তাই মানুষ যেন অশ্লীলতা থেকে সহজে বাঁচতে পারে সেজন্য আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলতার উপায় উপকরণকেও বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনা তো দূরের কথা অশ্লীলতার নিকটে যেতেও মহামহিম আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের বারণ করে অশ্লীলতার পথ রুদ্ধ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। অশালীনতার নিকটবর্তী না হওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾

"তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাসমূহের নিকটবর্তী হয়ো না।"[২৭]

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

"তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেও না, কারণ এটি অশ্লীল ও মন্দ পথ।"[২৮]

অশ্লীলতা বেড়ে গেলে মহামারীও বেড়ে যাবে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ حَتّٰى يُعْلِنُوْا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِيْ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِيْ أَسْلَافِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا.

'পাঁচটি জিনিস দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। সেই জিনিসগুলোর সম্মুখীন হওয়া থেকে আমি মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যখন কোনো জাতির মাঝে ব্যভিচার ও অশ্লীলতা প্রকাশ পায় এমনকি তা তারা ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে করতে থাকে, তখন তাদের মাঝে মহামারী, প্লেগ ও জনপদ বিধ্বংসী ব্যাধি দেখা দিবে, যা তাদের পূর্ব পুরুষদের মাঝে ছিল না।'[২৯]

শিক্ষণীয় বিষয়

হাদীসের আলোকে আমরা যদি জান্নাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি তাহলে নিম্নোক্ত তিনটি কাজ অবশ্যই করতে হবে–

১. আমরা যদি কোনো দায়িত্বের জায়গায় থাকি তাহলে অবশ্যই অধ:স্তনের প্রতি ন্যায়পরায়ন এবং তাদের (জনগণের) হক্ব আদায় করা এবং তাদের অভাব পূরণ করা।
২. আত্মীয়স্বজনের পাশাপাশি সকল মানুষের প্রতি আমাদের হৃদয় হবে কোমল এবং রহমশীল।
৩. দুনিয়ায় সকল প্রকার অশ্লীল ও অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

[২৫] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪৯৪১; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৪৯৬৯; সহীহাহ্- হা. ৯২৫।*
[২৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬৩/২৮৬৫।*
[২৭] *সূরা আল আন'আম : ১৫১।*
[২৮] *সূরা বানী ইস্‌রা-ঈল : ৩২।*
[২৯] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪০১৯; সহীহাহ্- হা. ১০৬।*

ইসলামী প্রবন্ধ :

সূরাতুল ফাতিহার বৈজ্ঞানিক তাফসীর : প্রসঙ্গ সূরার নামসমূহ

প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী*

আল-কুরআন অন্যান্য আসমানি গ্রন্থের মতোই একটি আসমানি গ্রন্থ। ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস। কিন্তু এ গ্রন্থকে অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের মতো একটি ধর্মগ্রন্থ বললে যেমন ভুল হবে তেমনি এ গ্রন্থকে অন্যান্য অভিধায় অভিহিত করাও ধৃষ্টতা হবে।

আল কুরআনের ৬২৩৬টি আয়াতের মধ্যে শরীয়তের বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন, হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ, আদেশোজ্ঞা-নিষেধাজ্ঞা বাদ দিয়ে বাকি সবগুলোই মানব জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সার্বিক বিষয়ে দিকনির্দেশনা সংক্রান্ত। তাই এতে বিশ্বের কোনো জ্ঞান গবেষণার বিষয় আলোচনা বাদ যায়নি। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖ﴾

"আমি কুরআনে কোনো কিছুর উল্লেখ বাদ রাখিনি।"[৩০]

তাই আল কুরআনে আমরা ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ের যেমন আলোচনা পাবো তেমনি বর্তমান বিশ্বের আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যা কিছু আছে সবগুলোর ইঙ্গিত কোনো না কোনোভাবে পেতে পারি এ আয়াতের নির্দেশনার আলোকে।

আমাদের বিজ্ঞানের মৌলিক কয়েকটি শাখা হলো পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ইত্যাদি। এগুলোর রয়েছে আবার ৪১৭টি শাখা প্রশাখা। মানুষের সীমিত জ্ঞানে বিজ্ঞানের এ শাখাগুলোকে বিভক্ত করতে গিয়ে খুব বেশিদূর এগোতে পারেনি। আসলে শাখা প্রশাখা ৪১৭টি নয়। ৪ হাজার বা ৪ লক্ষ ৪ কোটি হতে পারে। তাই আল কুরআনের এমন কোনো আয়াত পাওয়া যাবে না যে আয়াতে বৈজ্ঞানিক কোনো দিকনির্দেশনা নেই। কিন্তু এগুলো আসলে সীমিত জ্ঞানের মানুষের কাছে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

বৈজ্ঞানিক ধাঁচে আল-কুরআনের ভাষ্য রচিত হয়েছে বিশ্বের এরকম মুফাস্সিরের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকজন। তবে যে কয়টি তাফসীর রচিত হয়েছে সবগুলো আরবি ভাষায়। অন্যান্য ভাষায় তো নেই বাংলা ভাষায় তো কল্পনাই করা যায় না। অথচ এধরণের একটি তাফসীর না হলেও দু/একটি সূরার তাফসীর হতে পারত।

আল কুরআন তো অবশ্যই বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু আল-কুরআন ও বিজ্ঞান সম্পর্কে আমার জানাশোনা এক ধূলিকণার কোটি ভাগের এক ভাগও নেই। এরপরেও বিষয়টি আমাকে খুবই কষ্ট দিয়ে আসছে গত কয়েক বৎসর থেকে। বিজ্ঞানের ছাত্র না হওয়ায় বিজ্ঞান সম্পর্কে যেমন আমি কিছুই জানি না বা বুঝি না। আর আল কুরআনের সরাসরি ছাত্র না হওয়ার কারণেও আল কুরআন উচ্চারণে প্রথম বর্ণটি আলিফকেও সোজা করার ক্ষমতা আমার নেই।

তাই কুরআনকে বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা বা আলোচনা করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আমি আল কুরআন সম্পর্কে বিজ্ঞানের যে দু' চারটি দিক নির্দেশনা মূলক কথা বলব সেটাই যে চূড়ান্ত সেটাও আমি দাবি করছি না। আমি শুধু পাঠক সমাজকে একটু বিজ্ঞানের দিকে চোখ ফেরানোর জন্য দু'চারটি হরফ নাড়াচাড়া করার চেষ্টা করছি।

আল কুরআনুল কারীমে মোট ১১৪টি সূরা আছে। প্রত্যেকটি সূরার এক বা একাধিক নাম আছে। নামগুলো অধিকাংশই সূরার কোনো না কোনো আয়াতে বিবৃত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সূরার বিয়ষকে লক্ষ্য করেও নামকরণ করা হয়েছে।

* *আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

[৩০] *সূরা আল-আন'আম : ৩৮।*

সূরা আল-ফাতিহার অনেকগুলো নাম আছে। এগুলো সূরার বিষয়বস্তু সূরার মাহাত্ম্য গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়কে লক্ষ্য রেখে নামকরণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি নামই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যে সমৃদ্ধ।

১. ফাতিহাতুল কিতাব (فاتحة الكتاب) **:** মহান আল্লাহর কিতাবের সূচনা বা প্রারম্ভিকা। এটি আল কুরআনের উদ্বোধনী তথা সূচনা বা প্রারম্ভিক সূরা যা তার গুরুত্বের বার্তা বাহক। এটিকে আল কুরআনের ভূমিকা বা মুখবন্ধ বলা হয়। এখানে স্পষ্ট তো বিজ্ঞানের দু'টি বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে। একটি হলো খোলা ওপেন করা উন্মুক্ত করা উদ্বোধন করা আরম্ভ করা ইত্যাদি। কোনো ঘর বা কক্ষের দরজা খুলতে চাবির প্রয়োজন হয়। চাবি দিয়ে তালা খুলতে হয়। তালা চাবি উভয়টি ধাতুর তৈরি। এ দু'টোই বিজ্ঞানের অন্যতম আবিষ্কার।

২. সূরাতুল হামদ **(سورة الحمد) :** মহান আল্লাহর প্রশংসার সূরা। নবী বলেছেন,

سُوْرَةُ الْحَمْدُ هِيَ أَعْظَمُ سُوْرَةٍ فِيْ الْقُرْآنِ.

অর্থ : "আল হামদু সূরা কুরআনের মধ্যে যত সূরা আছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সূরা।"[৩১]

প্রশংসা হয়ে থাকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। অন্তরের যে সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয় সাইকোলজি বা মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞান।

৩. উম্মুল কুরআন (ام القرآن) **:** কুরআনের 'মা' অর্থাৎ- কুরআনের আদি মূল উৎস। উম্মুল অর্থ- মা। মা বংশবিদ্যা বিষয়ক বিজ্ঞানের একটি মৌলিক আলোচ্য বিষয়। মায়ের মাধ্যমেই বংশবিদ্যা রক্ষিত হয়।

আর এটি গাইনোকোলজি বা ধাত্রী বিদ্যা বিষয়ক বিজ্ঞানের আরেকটি ইঙ্গিত। কারণ মায়ের পেট থেকে সন্তান হয়। মায়ের গর্ভধারণ সন্তান জন্মদান এগুলো ধাত্রীবিজ্ঞান বিষয়ক। যা মেডিকেল সায়েন্সের মৌলিক বিষয়। আর আল কুরআন শব্দের অর্থ হলো পঠিত একত্রিত করা মিলিত হওয়া। সূরা আল-'আলাক্ব-এর প্রথম অবতীর্ণ আয়াতে পড়া, পাঠ করা বিষয়ের সরাসরি দিকনির্দেশনা রয়েছে। পড়াশোনা, জ্ঞান অর্জন এটা বিজ্ঞানের সবচাইতে মৌলিক বিষয় যেটা ছাড়া বিজ্ঞানের কোনো কিছুই জানা, বুঝা, উপলব্ধি করা বা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।

৪. উম্মুল কিতাব (ام الكتاب) **:** মহান আল্লাহর কিতাবের 'মা' বা মূল উৎস। কিতাবের একটি অর্থ হলো জমা বা একত্রিত করা। কিতাব যেহেতু বর্ণ শব্দ বাক্যে একত্রিত হয়ে পরিপূর্ণ গ্রন্থ রূপে আত্মপ্রকাশ করে এজন্য কিতাবকে কিতাব বলা হয়। কিতাব সকল জ্ঞানের উৎস বিশ্বের যাবতীয় বিষয় এতেই একত্রে সংরক্ষিত থাকে। এছাড়া কিতাব হলো লিখিত বর্ণের সমষ্টি রূপ। কিতাব লিখতে কাগজ কলম কালি ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর প্রয়োজন হয়। অতএব উম্মুল কিতাব নামটি বিজ্ঞানের অনেকগুলো শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট।

৫. আসসাবউল মাসানী (السبع المثانى) **:** পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত আয়াত সপ্তক। বার বার পাঠ করা সত্ত্বেও তার মাধুর্য, লালিত্য, সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য কম হবে না; বরং যতই বেশি পাঠ করা যাবে, ততই তার গভীরতা, ব্যাপকতা, সৌন্দর্য ও মাধুর্য ক্রমেই বেশি হৃদয়ঙ্গম হতে থাকবে। এখানে আসসাবউল মাসানী দু'টি শব্দই সংখ্যা বাচক বিশেষ্য। আল কুরআনে ৩২টি সংখ্যা উল্লেখ রয়েছে। সংখ্যা গণিতবিজ্ঞান, কম্পিউটারবিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান-এর মৌলিক উৎস।

৬. সূরাতুল ওয়াফিয়াহ্ (سورة الوافيه) **:** পরিপূর্ণ সূরা। সূরাতুল ফাতিহায় আয়াত সংখ্যা ৭ হলেও এটি ৬২৩৬ আয়াতবিশিষ্ট আল কুরআনের মৌলিক এবং পরিপূর্ণ সংক্ষিপ্ত সার। অত্যন্ত সংক্ষেপ হওয়া সত্ত্বেও ভাষা, ভাব, বিষয়বস্তু এবং সার্বিক আলোচনায় এই সূরাটি পরিপূর্ণ। এই সূরাটির মধ্যে অসম্পূর্ণ কিছু নেই।

৭. সূরাতুল কাফিয়াহ্ (سورة الكافيه) **:** অর্থাৎ- সার্বিক দিক থেকে এ সূরাটি যথেষ্ট। অর্থাৎ- মানুষের ঈমান 'আক্বিদাহ্ 'ইবাদত বন্দেগী স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক মানুষের কর্ম কর্মফলপ্রাপ্তি মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সফলতার জন্য এই সূরাই মানুষের জন্য যথেষ্ট। আসলে একজন মানুষের সারা জীবন

[৩১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৪৭৪।*

পরিচালনার জন্য যা প্রয়োজন সবকিছু বিজ্ঞানের কোনো না কোনো বিষয়ের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। তাহলে সূরা আল-ফাতিহাহ্ মানব জীবনের সার্বিক পর্যায়ে যথেষ্ট এ সূরার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী মানুষ জীবন পরিচালিত হলে তার অন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই।

৮. সূরাতুল কানয (سورة الكنز) **:** জ্ঞানখনি, জ্ঞান ভাণ্ডার বা জ্ঞানাকর। বিশ্বের সৃষ্টির আদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত যত ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান যত কিছু আবিষ্কার হবে সবকিছুর ইঙ্গিত এ সূরাতে রয়েছে। এজন্য এ সূরার এ ধরনের নামকরণের সার্থকতা হয়েছে।

৯. আসাসুল কুরআন (اساس القرآن) **:** Quranic foundation বা কুরআনের ভিত্তি। ভিত্তি স্থাপন যে কোনো স্থাপনা কনস্ট্রাকশনের মূল জিনিস। এটি সরাসরি আর্কিটেকচার (architecture) বা স্থাপত্য শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ- কুরআনে যত প্রকারের ইল্ম বিধৃত হয়েছে, সকল প্রকার মৌলিক জ্ঞানের ভিত্তি হলো সূরা আল-ফাতিহাহ্।

১০. তা'লীমুল মাস'আলা (تعليم المسئلة) **বা প্রার্থনা শিক্ষা :** মহান আল্লাহর কাছে কিভাবে চাইতে হবে সে বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এ সূরাতে। এই সূরাটিতে মানব জীবনের সদাচরণের একটি উত্তম দিকের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বড়দের কাছে ছোটদের চাওয়া প্রার্থনা করা গ্রহণ করা নেওয়ার ভঙ্গিমা ইত্যাদি বিষয় কি পদ্ধতিতে হতে হবে তার শিক্ষা রয়েছে এখানে– **১.** মহান আল্লাহর কাছে চাওয়াটা প্রশংসিত হতে হবে। **২.** দাতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এটি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতে হবে। **৩.** মহান আল্লাহর সৃষ্টি সব সময় তার মুখাপেক্ষী। **৪.** দান সম্পূর্ণ দাতার উপরে নির্ভর করে গ্রহীতার উপরে নয়। **৫.** প্রার্থনার উদ্দেশ্য ইতিবাচক হতে হবে নেতিবাচক নয়। **৬.** তারপর মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

১১. সূরাতুল-মোনাজাত (سورة المناجاة) **:** মুনাজাত অর্থ চুপিসারে কথা বলা কানাঘুষা করা একান্ত আপনজনের সাথে গোপন আলাপ করা, মনের আবেগ সবকিছু বন্ধুর কাছে অকপটে খুলে বলা ইত্যাদি। কথা যেভাবেই বলা হোক না কেন সেটা বাক যন্ত্র থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বাকযন্ত্র ধনী বিজ্ঞানের বিষয়। তাছাড়া কথা গলা থেকে বের হয়। চুপিসারে কথা বলতে কানের দরকার হয়। আর নাক কান গলা এগুলো কে medical science একসঙ্গে ENT বলা হয়। এগুলো শারীরবিদ্যা বা এনাটমি (anatomy)'র অন্তর্ভুক্ত। আল কুরআনে ৪২টি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা উল্লেখ আছে।

১২. সূরাতুত তাফবীয (سورة التفويض) **:** তফবীয অর্থ সমর্পণ করা। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَأُفَوِّضُ أَمْرِيٓ إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌۢ بِالْعِبَادِ.

"আমি আমার বিষয়ে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। তিনি নিশ্চিত বান্দার সর্বদ্রষ্টা।"[৩২]

সমর্পণ যে কোনো অঙ্গের মাধ্যমেই হতে হয় যেমন আত্মসমর্পণ যদি হয় সেটা আত্মার মাধ্যমে করতে হয় আর আত্মা এটি সাইকোলজি বা মনোবিজ্ঞানের বিষয়।

মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা মানুষের কর্তব্য। এই শিক্ষা এই সূরার মাধ্যমে দেয়া হয়েছে।

১৩. সূরাতুদ্ দু'আ : এই সূরাটির নাম সূরাতুদ দু'আ বা প্রার্থনা সূরা। বান্দা তার প্রভুর কাছে কিভাবে দু'আ করবে সে বিষয়টি যেমন এই সূরাতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তেমনি দু'আর মধ্যে এই সূরাটি দিয়ে দু'আ করতে হবে এ বিষয়টির ইঙ্গিত আছে। দু'আতে মানুষ তাঁর রবের কাছে মনের কথা খুলে বলে, মনের সকল ব্যথা প্রকাশ করতে পারে। মনের আবদার আরজু আবেগ অনুভূতি সব ধরনের চাওয়া পাওয়া তার দরবারে পেশ করতে পারে। দু'আ মানুষ তার মন থেকে করে থাকে মুখ দিয়ে করে থাকে। মন মুখ দু'টি মানুষের শারীরিক বিজ্ঞান তথা এনাটমির অন্তর্ভুক্ত।

১৪. সূরাতুশ শেফা (سورة الشفا) **:** রোগ আরোগ্যের সূরা রোগ নিরাময়ের সূরা। রোগ চিকিৎসা নিরাময়ের জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করা বিষয়ে আমাদের মুসলিমদের মধ্যে এখনও নেতিবাচক ধারণা রয়েছে।

---

[৩২] *সূরা আল-মু'মিনূন : ৪৪।*

ধর্মীয় গোড়াপন্থী যারা তাদেরকেও কেউ কেউ মনে করেন যে রোগ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন তিনি ছেড়ে দেবেন বিষয়টি তা নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ اِلَّا جَعَلَ لَه دَوَاءً فَاِذَا مَرِضْتُمْ فَتَدَاوَوْا.

অর্থাৎ- এমন কোনো রোগ নেই যার নিরাময় বা ঔষধ সৃষ্টি করেননি। তাই তোমরা রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসা করবে ঔষধ গ্রহণ করবে রোগ নিরাময়ের জন্য চেষ্টা করবে।

সাধারণতঃ আমাদের রোগ ব্যাধি হয়ে থাকে স্বাস্থ্যবিধি পালন না করার কারণে। আমাদের চলাফের খাওয়া-দাওয়া, প্রাকৃতিক কর্ম সাধন করা ইত্যাদিতে ব্যতিক্রম হওয়ার কারণে। মানব জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করলেই রোগের সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলা সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রাকৃতিক ৯টি স্বাস্থ্য বিধান দিয়েছেন :

১. নিয়মিত ও পরিমিত সুখাদ্য গ্রহণ করা, **২.** নির্মল পানীয় সেবন, **৩.** নির্মল বায়ু গ্রহণ করা, **৪.** নিয়মিত শারীরিক প্রশ্রিম করা, **৫.** নিয়মিত ও পরিমিত বিশ্রাম করা, **৬.** বয়স অনুযায়ী পরিমিত নিদ্রা যাওয়া, **৭.** পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য নিয়মিত গোসল করা, **৮.** শরীরের জন্য জমে থাকা ময়লা পরিত্যাগের জন্য নিয়মিত প্রশাব, পায়খানা এবং বায়ু রোধ না করা, **৯.** সংযমী হওয়া অর্থাৎ- কাম ক্রোধ, লোভ, রিপুকে সীমার মধ্যে রাখা।

প্রকৃতিক এই নয়টি নিয়মের যে কোনো একটি লঙ্ঘিত হলেই সাধারণতঃ শরীরে একাধিক রোগ জন্মে। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "এ সূরাটি যে কেমন করে আত্মার সমস্ত রোগের ঔষধ, কেমন করে এতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ লুক্কায়িত আছে, সে সব ব্যাখ্যা করতে গেলে আমি সত্তর উটের বোঝা কিতাব লিখিতে পারি। এ জন্য এটাকে সূরাতুশ শেফা বলা হয়েছে।

১৫. সূরাতুশ শোকর (سورة الشكر) : অর্থ প্রশংসার সূরা। এ সূরার মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রশংসা করা হয়ে থাকে প্রতি সলাতে। মহান আল্লাহর প্রশংসা মানুষের মন থেকে মানুষের মুখ থেকে হয়ে থাকে। মন এবং মুখ দু'টি শারীরিক বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

১৬. সূরাতুস সলাত (سورة الصلوة) : অর্থাৎ- সলাতের সূরা। এ সূরাটি সলাতের প্রতিটি রাক'আতে তিলাওয়াত করা বাধ্যতামূলক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন,

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

সূরা আল-ফাতিহাহ্ ছাড়া সলাত পরিপূর্ণ হয় না।[৩৩]

তাই এ সূরাকে সূরাতুস্ সলাত বলা হয়ে থাকে।

সলাত একটি শারীরিক 'ইবাদত। সলাতের মধ্যে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ নিবিষ্ঠ রাখতে হয়। মানুষের অঙ্গ এনাটমি তথা শারীরিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

১৭. সূরাতুন্ নূর (سورة النور) : নূরের সূরা। নূর অর্থ আলো। এ সূরার মাধ্যম হিদায়াতের আলো পাওয়া যায় বিধায় এ সূরাটিকে সূরাতুন্ নূর নামে অভিহিত করা হয়েছে।

১৮. সূরাতুর্ রোকইয়া (سورة الرقية) : ঝাড়-ফুঁকের সূরা। ঝাড়ফুঁক করতে হলে সেটা মুখ দিয়েই করতে হয়। মুখ শারীরিকবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। রোগ রোগী পথ্য রোগ নিরাময়ের জন্য যেকোনো পদ্ধতি ব্যবহার সবগুলোই চিকিৎসা বিজ্ঞান (medical science)-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

১৯. সূরাতুল হামদ (سورةالحمدر) : প্রশংসার সূরা। আরবি ভাষায় হামদ (الحمد) এবং মাদাহ (مدح) দু'টি প্রশংসার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু হামদ শব্দটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর প্রশংসার ক্ষেত্রে খাস।

পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে এ সূরার মাধ্যমে মহান আল্লাহর গুনোগান ও প্রশংসা করা হয়ে থাকে বলে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরাতুল হামদ। মনের আবেগ অনুভূতির মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রশংসা করা হয়ে থাকে। আর মন শারীরিক বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

---

[৩৩] *জামে' আত্-তিরমিযী- ২/২৫।*

উত্তম মৃত্যুর কিছু আলামত ও আমাদের করণীয়

কে. এম আব্দুল জলিল*

ভূমিকা : মৃত্যু অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾

"জীবনমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।"[১]

তিনি আরো বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা মাতৃগর্ভে আছে। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।"[২]

এই অনিবার্য ও চিরন্তন সত্য বিষয়টিকে পাশ কাটানোর কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং আমাদের মৃত্যু যেন উত্তমরূপে হয়, সেজন্য বিশুদ্ধ ঈমান সহকারে সদা কর্মতৎপর থাকতে হবে। নিম্নে উত্তম মৃত্যুর বর্ণনা, উত্তম মৃত্যুর কতিপয় নিদর্শন, উত্তম মৃত্যুর জন্য করণীয় প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

উত্তম মৃত্যু : উত্তম মৃত্যু হলো মৃত্যুর পূর্বে মানুষের এমন কর্ম সম্পাদন করা, যা তার প্রতিপালকের ক্রোধ হতে তাকে বাঁচাতে সাহায্য করে এবং মৃত্যুর পূর্বেই তাওবায়ে নাসুহা সম্পন্ন করে। সেই সাথে সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করতে করতেই সে একসময় মৃত্যুবরণ করে এবং পাপমুক্ত হয়ে পরপারে পাড়ি জমায়। রাসূল (ﷺ) বলেন, "যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে যোগ্য করে তোলেন। বলা হলো– হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! কিভাবে তিনি তাকে যোগ্য করে তোলেন? তিনি বললেন, তিনি তাকে তার মৃত্যুর পূর্বে সৎকর্ম সম্পাদনের তাওফীক্ব দান করেন।"[৩] কোনো বান্দা জাহান্নামীদের কাজ করতে থাকে, অথচ সে মূলতঃ জান্নাতী। এভাবে কোনো বান্দা জান্নাতীদের কাজ করতে থাকে, অথচ সে জাহান্নামী। বস্তুতঃ শেষ 'আমলসমূহই গ্রহণযোগ্য।[৪]

উত্তম মৃত্যুর কতিপয় নিদর্শন : উত্তম মৃত্যুর অন্যতম নিদর্শন হলো সৎকর্মশীল বান্দাকে তার মৃত্যুর সময় তার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির সংবাদ প্রদান করা এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মানের কথা জানানো। এক্ষেত্রে প্রতিটি সৎকর্মশীল মু'মিনের কর্তব্য হবে, আমৃত্যু দ্বীনের হক্বের উপর দৃঢ়ভাবে টিকে থাকা। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ﴾

"নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, তারপর অবিচলিত থাকে, তাদের কাছে নাযিল হয় ফেরেশ্‌তা (এ বলে) যে, তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হয়।"[৫]

---

* *সভাপতি, ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

[১] *সূরা আ-লি-'ইমরান : ১৮৫।*

[২] *সূরা লুক্বমা-ন : ৩৪।*

[৩] *জামে আত্ তিরমিযী- হা. ২১৪২; মিশকাত- হা. ৫২৮৮।*

[৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৬০; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ৮৩।*

[৫] *সূরা হা-মীম, আস-সাজদাহ/ফুস্‌সিলাত : ৩০।*

'আব্দুর রহমান নাসের আস-সা'দী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এই সুসংবাদ মু'মিনের মৃত্যুর সময় জানানো হয়'।[১] ফলে সন্তুষ্টচিত্তে মু'মিন তার রবের সাক্ষাৎ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে।

১) কষ্টকর মৃত্যুই উত্তম মৃত্যু : অনেকের ধারণা হতে পারে যে, উত্তম মৃত্যু বলতে সহজভাবে ও রোগ-দুঃখ ব্যতীত মৃত্যুবরণকে বুঝায়। এটা সবক্ষেত্রে নাও ঘটতে পারে। কারণ রাসূল (ﷺ) বলেন,

«مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ».

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান, তাকে বিপদে ফেলেন।[২]

অন্যদিকে রাসূল (ﷺ)-এর মৃত্যুর পূর্বে ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হলো তিনি নিকটস্থ পানির পাত্রে হাত ভিজিয়ে মুখমণ্ডল মাসাহ করে বললেন, 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, নিশ্চয়ই মৃত্যুর যন্ত্রণা ভীষণ কঠিন।'[৩] একদিন সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন কারা হবে? তিনি বলেন, "নবীগণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন। অতঃপর মর্যাদার দিক তাঁদের পরবর্তীগণ, অতঃপর তাঁদের পরবর্তীগণ। মানুষকে তার ঈমান ও ধর্মানুরাগ অনুপাতে পরীক্ষা করা হবে। যদি সে তার দ্বীনদারীতে অবিচল থাকে, তবে তার পরীক্ষাও তত কঠিন হবে। আর সে যদি দ্বীনদারীতে শিথিল হয়, তবে তার পরীক্ষাও তদানুপাতে হাল্কা হয়। বান্দা এভাবে হর-হামেশা বিপদ-আপদ দ্বারা পরীক্ষিত হতে থাকে। অবশেষে যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত-পরিচ্ছন্ন হয়ে সে পৃথিবীতে বিচরণ করে।"[৪] 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তিনি প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! ভীষণ জ্বরে আপনি তো পর্যুদস্ত হয়ে আছেন। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তোমাদের দু'জনের জ্বরের সমপরিমাণ জ্বরে আক্রান্ত হই। তখন আমি বললাম, এটা এ জন্য যে, আপনার জন্য সওয়াবও দ্বিগুণ রয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই তা সঠিক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "যে কোনো মুসলিম বিপদগ্রস্ত হয়, তা একটি কাঁটাবিদ্ধ হওয়া কিংবা আরো তুচ্ছ কিছু হোক না কেন, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার পাপরাশি মোচন করেন, যেভাবে বৃক্ষ তার পত্রপল্লব ছেড়ে ফেলে।"[৫] জনৈকা হাবশী নারী রাসূল (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই। রোগের তীব্রতায় আমি বিবস্ত্র হয়ে যাই। আমার জন্য মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন, তুমি চাইলে ধৈর্যধারণ করতে পার। তাহলে তোমার জন্য রয়েছে জান্নাত। আর তুমি চাইলে আমি তোমার রোগমুক্তির জন্য দু'আ করব, যেন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে পূর্ণ সুস্থ করে দেন। তখন মহিলাটি জবাবে বলল, আমি বরং ধৈর্যধারণ করব, অতঃপর সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! (ﷺ) আমি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ি, তখন বিবস্ত্র হয়ে যাই। আমি যেন বিবস্ত্র না হয়ে পড়ি, সেজন্য দু'আ করুন। ফলে রাসূল (ﷺ) তার জন্য দু'আ করলেন।[৬] অতএব, কারো জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর সময় কেউ অধিক পরিমাণে কষ্ট পেলে তার উপর খারাপ ধারণা করা ঠিক নয়। কারণ এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে দুনিয়া থেকেই পাপমুক্ত করে পরিচ্ছন্ন অবস্থায় আখিরাতের জন্য প্রস্তুত করেন।

২. মৃত্যুর সময় কপাল মৃদু ঘর্মাক্ত হওয়া : মু'মিনের উত্তম মৃত্যুর আরেকটি নিদর্শন হলো, মৃত্যুর সময় যন্ত্রণার প্রচণ্ডতায় মু'মিনের কপাল মৃদুভাবে ঘর্মাক্ত হতে পারে। রাসূল (ﷺ) বলেন, "মু'মিন মৃত্যুবরণ করে কপালে মৃদু ঘাম নিয়ে।"[৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, "তোমরা তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তিদেরকে 'লা- ইলা-হা

---

[১] *তাফসীরে সা'দী- সূরা হা-মীম, আস্-সাজদাহ্/ফুস্সিলাত ৪১ : ৩০ আয়াতের ব্যাখ্যা, পৃ. ৭৪৮।*
[২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬৪৫, ৫৬৪৬; মিশকাত- হা. ১৫৩৬।*
[৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৪৪৯; মিশকাত- হা. ৫৯৫৯।*
[৪] *জামে আত্ তিরমিযী- হা. ২৩৯৮; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪০২৩; সহীহুত্ তারগীব- হা. ৩৪০২।*
[৫] *বুখারী- হা. ৫৬৪৮; মুসলিম- ২৫৭১; মিশকাত- হা. ১৫৩৮।*
[৬] *বুখারী- হা. ৫৬৫২; মুসলিম- ২৫৭৬; মিশকাত- হা. ১৫৭৭।*
[৭] *আত্ তিরমিযী- ৯৮২; সুনান আন্ নাসায়ী- ১৮২৮, ১৮২৯; মুসনাদ আহমাদ- হা. ২৩০৭২; মিশকাত- হা. ৫২৮৮।*

ইল্লাল্লা-হু' শিক্ষা দাও। কেননা মু'মিনের আত্মা বের হয় ঘাম বের হওয়ার ন্যায় (সহজভাবে)। আর কাফিরের আত্মা বের হয় মুখ দিয়ে যেমন গাঁধার আত্মা বের হয় (কঠিনভাবে)"।[১]

৩. জুমু'আর রাত্রি বা দিবসে মৃত্যুবরণ করা : মুসলমানদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন হলো জুমু'আর দিন। এ দিনের যে কোনো সময় মৃত্যুবরণ করা উত্তম মৃত্যুর অন্যতম নিদর্শন। রাসূল (ﷺ) বলেন, কোনো মুসলমান যদি জুমু'আর দিবসে অথবা রাত্রিতে মারা যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরের ফিৎনা হতে রক্ষা করেন।[২]

৪) শহীদী মৃত্যু ও মর্যাদাগত শহীদ : আল্লাহর কালেমা উড্ডীন করণার্থে ময়দানে শহীদ হওয়া উত্তম মৃত্যুর অন্যতম প্রধান আলামত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۞ فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۞ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

"যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়, তাদেরকে মৃত্যু ভেবো না; বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে রিয্কপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে যা দিয়েছেন, তাতেই তারা আনন্দিত। আর তারা আনন্দ প্রকাশ করে তাদের পিছনে রেখে আসা মুজাহিদগণের জন্য, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি এই বলে যে, তাদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তাদের চিন্তারও কোনো কারণ নেই। তারা আল্লাহর নিকট থেকে অনুগ্রহ ও কল্যাণ লাভের কারণে আনন্দ প্রকাশ করে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করবেন না।"[৩]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "তোমাদের মধ্যে কাকে তোমরা শহীদ বলে গণ্য করো? সাহাবীগণ বললেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে নিহত হয়, সে তো শহীদ। তিনি বলেন, তাহলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য হবে; বরং যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে, সে শহীদ। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে (নিয়োজিত থেকে স্বাভাবিকভাবে) মৃত্যুবরণ করে, সেও শহীদ এবং যে ব্যক্তি প্লেগে (মহামারিতে) মৃত্যুবরণ করে, সেও শহীদ। আর যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণ করে, সেও শহীদ।"[৪]

তিনি আরো বলেন, "পাঁচ শ্রেণীর মানুষ শহীদ হিসেবে গণ্য হবে। যেমন- **(১)** মহামারীতে নিহত ব্যক্তি, **(২)** পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তি, **(৩)** পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, **(৪)** মাটি বা যে কোনো বস্তুতে চাপা পড়ে নিহত ব্যক্তি এবং মহান আল্লাহর পথে দৃঢ় থাকা অবস্থায় মৃত ব্যক্তি।[৫] তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে শাহাদাতের আকাঙ্খা পোষণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে শহীদের মর্যাদায় ভূষিত করেন; যদিও সে স্বীয় বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।"[৬]

৫) মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী মুসলিম ব্যক্তি : রাসূল (ﷺ) বলেন, "প্লেগে মৃত্যুবরণকারী প্রত্যেক মুসলমান শাহাদাতের মর্যাদা পাবে।"[৭] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মহামারীতে মৃত্যুবরণকারীদের পরকালীন অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "এটি হলো শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা যার প্রতি ইচ্ছা করেন তা প্রেরণ করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য তাকে রহমতস্বরূপ গণ্য করেছেন। যে কোনো ব্যক্তি প্লেগে (মহামারী) আক্রান্ত অঞ্চলে থাকলে সওয়াবের নিয়তে সেখানেই অবস্থান করে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা যা তার জন্য নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত তার উপর অন্য কিছুই

---

[১] *ত্বাবারানী কাবীর- হা. ১০৪১৭; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক্ব- হা. ৬৭৭২; সহীহুল জামে'- হা. ৫১৪৯।*
[২] *জামে আত্ তিরমিযী- হা. ১০৭৪; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৩৬; সহীহুল জামে'- হা. ৫৫৭৩।*
[৩] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৬৯-১৭১।*
[৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৯১৫; মিশকাত- হা. ৩৮১১।*
[৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৮২৯; সহীহ মুসলিম- হা. ১৯১৪; জামে আত্ তিরমিযী- হা. ১০৬৩।*
[৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৯০৯; মিশকাত- হা. ৩৮০৮।*
[৭] *বুখারী- ২৮৩০, ৫৭৩২; মুসলিম- ১৯১৬; মিশকাত- ১৫৪৫।*

পতিত হবে না, তবে তার জন্য শহীদের অনুরূপ সওয়াব রয়েছে।"[১]

৬. আগুনে পুড়ে, পিষ্ট হয়ে এবং সন্তান প্রসবকালীন মৃত্যুবরণকারী : রাসূল (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি পুড়ে মারা যায়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি কোনো কিছু চাপা পড়ে পিষ্ট হয়ে মারা যায়, সে শহীদ এবং প্রসবকালীন কষ্টে প্রসূতী মৃত নারী শহীদ।"[২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, "সন্তান ভূমিষ্টকালে মৃত্যুবরণকারিণী মাতাকে তার বাচ্চাটি নাভিস্থিত নাড়ীতে টেনে টেনে জান্নাত অভিমুখে নিয়ে যাবে।"[৩]

৭) দ্বীন, সম্পদ, জীবন ও স্বজন রক্ষায় নিহত ব্যক্তি : সমাজে অহরহ ঘটছে খুনাখুনি। প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজে এ রকম চিত্র দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে দ্বীন, সম্পদ, জীবন ও স্বজন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত ব্যক্তি শাহাদাতের মর্যাদায় বিভূষিত হবে। রাসূল (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার দ্বীন রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার জীবন রক্ষার্থে নিহত হয়, সে শহীদ। আর যে ব্যক্তি তার আত্মীয়-স্বজন রক্ষার্থে নিহত হয়, সেও শহীদ।"[৪]

৮) মহান আল্লাহর পথে সর্বদা প্রস্তুত দায়িত্বশীলগণ : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ করো ও ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো এবং সদা প্রস্তুত থাকো। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[৫]

রাসূল (ﷺ) বলেন, "আল্লাহর রাস্তায় একদিন ও এক রাতের সীমান্ত পাহারা দেয়া, একমাস সিয়াম পালন এবং 'ইবাদতে রাত্রি জাগরণের চাইতেও উত্তম। আর যদি এ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে, তবে তার 'আমলের সওয়াব প্রবহমান থাকবে এবং তার জন্য শহীদী রিয্ক জারী করা হবে। আর সে ব্যক্তি পরকালীন যাবতীয় বালা-মুসীবত হতে নিরাপদ থাকবে।"[৬]

৯) সৎকর্মের উপর সুদৃঢ় থেকে মৃত্যুবরণকারী : রাসূল (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর চেহারা কামনায় লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু বলবে এবং এ 'আমলই তার সর্বশেষ 'আমল হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৭]

১০) মৃত্যুকালীন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতর হওয়া : রাসূল (ﷺ)-এর মৃত্যুর সময় প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভূত হলে ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, "হায় আব্বা, কি ভীষণ যন্ত্রণা! তখন তিনি বলেন, আজকের দিনের (মৃত্যুর) পর তোমার আব্বার আর কোনোই যন্ত্রণা থাকবে না।"[৮] অনুরূপ বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যুকালীন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করলে তাঁর স্ত্রী বেদনাবিধূর হয়ে বললেন, 'হায় বিলাল! কি দুঃসহ যন্ত্রণা'! অতঃপর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে স্বীয় স্ত্রীকে এমন কথা বললেন, যাতে মৃত্যু যন্ত্রণার সাথে মাধুর্যও মিশানো ছিল। তিনি বলেন, 'আহা কি আনন্দ! কেননা মৃত্যু হয়ে গেলেই রাসূল (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাতের রাস্তা খোলাসা হয়ে যাবে'। অতঃপর তিনি বললেন, 'এইতো আগামীকালই প্রিয়তম রাসূল (ﷺ) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে সাক্ষাত করব'।[৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ﴾

"এটা আখিরাতের সে আবাস যা আমরা নির্ধারিত করে তাদের জন্য যারা যমীনে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।"[১০]

[চলবে ইন শা-আল্লাহ]

---

[১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৭৪; মিশকাত- হা. ১৫৪৭।*
[২] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩১১১; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৫৬১; সহীহুত তারগীব- হা. ১৩৯৮।*
[৩] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৬০৪১; সহীহুত তারগীব- হা. ১৩৯৬।*
[৪] *জামে আত্ তিরমিযী- হা. ১৪২১; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪০৯৫; আহমাদ- হা. ১৬৫২; সহীহুত্ তারগীব- হা. ১৪১১।*
[৫] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ২০০।*
[৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৯১৩; সহীহুত্ তারগীব- হা. ১২১৭।*
[৭] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ২০৩৭২; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ- হা. ৩৯১৯, ১১৩৫; আহকামুল জানায়েয- খণ্ড : ১, পৃ. ৪৩।*
[৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৪৬২; মিশকাত- হা. ৫৯৬১।*
[৯] *আলাল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিইয়া- শারহুয যুরক্বানী, খণ্ড : ১, পৃ. ৪৯৯; আশ-শিফা- কাযী ইয়ায, খণ্ড : ২, পৃ. ৫৮।*
[১০] *সূরা আল-ক্বাসাস : ৮৩।*

সলাত অমান্য ও অবহেলাকারীর পরিণাম

হাফেয মুহাম্মদ আইয়ূব*

[তৃতীয় (শেষ) পর্ব]

অমনোযোগী সলাত আদায়কারীর পরিণাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ﴾

"ঐ সমস্ত সলাত আদায়কারীর জন্য ধ্বংস যারা তাদের সলাতে অমনোযোগী।"[১]

অর্থাৎ- তা হতে গাফিল এবং নির্দিষ্ট সময়ে তা আদায় করে না, অথবা ওযর ব্যতীতই দেরি করে আদায় করে।

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوْا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوْا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾

"তারপর তাদের পরে পরবর্তীগণ যারা সলাতসমূহকে নষ্ট করল এবং নিজেদের খেয়াল খুশীমত চলতে শুরু করল, শীঘ্রই তারা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।"[২]

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন : সম্পূর্ণরূপে সলাত পরিত্যাগ করা নয়; বরং তার অর্থ একেবারে শেষ ওয়াক্তে সলাত আদায় করা।

ইমামুত তাবি'ঈন সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যাব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : (তারা সলাত নষ্ট করল) এর অর্থ হচ্ছে– 'আস্‌রের ওয়াক্ত অত্যাসন্ন হওয়ার সময় যোহর আদায় করা, মাগরিবের সাথে মিলিয়ে 'আস্‌র আদায় করা, 'ইশার সাথে সংযুক্ত করে মাগরিব আদায় করা, 'ইশার সলাত ফজর পর্যন্ত বিলম্বিত করা এবং সূর্যোদয়ের সময় ফজর আদায় করা। সুতরাং এ অবস্থায় থাকাকালীন ইন্তিকাল করল অথচ তাওবাহ্ করেনি, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য 'গাইয়্যুন' তৈরি করে রেখেছেন। আর এটা হচ্ছে জাহান্নামের একটি গর্ত যা অত্যন্ত সুগভীর এবং এর স্বাদ অত্যন্ত কদর্য ও কুৎসিত। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

"সেই 'আমালকারীদের জন্য দুর্ভোগ যারা তাদের সলাত সম্পর্কে উদাসীন ও গাফিল।"[৩]

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট যারা সলাত সম্পর্কে উদাসীন তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন : তা হচ্ছে– শেষ ওয়াক্তে সলাত আদায় করা অর্থাৎ- একেবারে প্রান্তিক সময়ে সলাত আদায় করা। বিলম্বে হলেও তারা সলাত আদায় করে বলে এখানে ও-য়াইল শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে ও-য়াইল অর্থাৎ- কঠিন শাস্তি।

কেউ কেউ বলেন, 'ওয়াইল' হচ্ছে জাহান্নামের একটি নিম্নভূমি। দুনিয়ার পাহাড়-পর্বত তার মধ্যে রাখা হলে তার কঠিন উত্তাপে তা গলে যাবে অথচ এ স্থানটিই হবে বিলম্বে সলাত আদায়কারী ও উদাসীন সলাত আদায়কারীদের স্থায়ী আবাসস্থল। তবে যারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবাহ্ করবে এবং কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে তাদের আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিক্‌র হতে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"[৪]

মুফাস্‌সিরে কিরাম বলেন : আলোচ্য আয়াতে 'মহান আল্লাহর যিক্‌র' দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত সলাত বুঝানো হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি যথাসময়ে সলাত আদায় থেকে গাফিল হয়ে বেচাকেনা, উপার্জন, জীবিকা সংগ্রহ ও সন্তান-সন্ততির সাথে খেল-তামাশায় বিভোর থাকবে, সেই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৫]

নবী (ﷺ) বলেছেন : কিয়ামতের দিন বান্দা থেকে যে সম্পর্কে সর্বপ্রথম হিসাব নেয়া হবে তা হচ্ছে সলাত। যদি সলাত ঠিক হয়ে যায় তাহলে সে কামিয়াব ও

---

* *সভাপতি, আহলে হাদীস লাইব্রেরী, বংশাল, ঢাকা।*
[১] *সূরা আল-মা'ঊন : ৪-৫।*
[২] *সূরা মারইয়াম : ৫৯।*
[৩] *সূরা আল-মা'ঊন : ৪-৫।*
[৪] *সূরা আল-মুনা-ফিকুন : ৯।*
[৫] *কিতাবুল কাবায়ির- ইসলামিক ফা. বাং, ছাপা, ২১-২২ পৃ.।*

সফলকাম হবে এবং যদি সলাত অসম্পূর্ণ হয় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদে পতিত হবে।[১]

সলাতে মনকে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ না করে অন্য কোনো ভাবনায় নিমজ্জিত হওয়া। (নামাযি) যখন অন্য মনস্ক হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা ও ঐ বান্দার মাঝে পর্দা পড়ে যায়। তখন ঐ অন্তরে শয়তান প্রবেশ করে এবং তার সামনে দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয় উপস্থিত করে এবং সেও মহিলার আকৃতি নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়। আবার যখন মনকে আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরিয়ে আনে এবং অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি না থাকে তখন শয়তান আল্লাহ তা'আলা ও ঐ হৃদয়ের মাঝে প্রভাব ফেলতে পারে না।

রাসূল (ﷺ)-এর কথাটি স্মরণ করুন, যখন তিনি একটি ক্বরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন বললেন : এটা কার ক্বর? তারা বললেন : অমুক ব্যক্তির ক্বর। তখন তিনি (ﷺ) বললেন : (এখন) এই ব্যক্তির নিকট দু'রাক'আত সলাত তোমাদের দুনিয়ার সকল কিছুর চেয়ে অধিক উত্তম।[২]

আমার সলাত কোন্ স্তরের হচ্ছে তা ভেবে দেখব না? কেন আমরা দুনিয়াদারদের সঙ্গে এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবো? হারাম খাচ্ছি না হালাল খাচ্ছি এই চেতনা আমার হবে না কেন? সলাতে সুফল পাওয়া যায় না কেন? আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

"নিশ্চয়ই সলাত অশ্লীলতা এবং আপত্তিকর কাজ থেকে বিরত রাখে।"[৩]

এ আয়াতটির ব্যাপারে এক প্রশ্নের উত্তরে নবী (ﷺ) বলেন, যার সলাত তাকে অশ্লীল এবং আপত্তিকর কথা ও কাজ থেকে বিরত রাখে না তার সলাতই হয় না।[৪]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন– নবী (ﷺ) বলেন : লোকদের ওপর একটি যুগ আসবে যখন তারা বাহ্যতঃ সলাত আদায় করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা সলাত আদায় করবে না।[৫]

এর একটা কারণ এ হতে পারে যে, তারা রুকূ' ও সাজদাহ্ ঠিকমত পালন করবে না এবং ক্বিরাআতও শুদ্ধ তিলাওয়াত করবে না; বরং দ্রুত করে রুকূ' ও সাজদাহ্ দিয়ে কোনো রকম দায়সারা সলাত শেষ করে পালাবে– যেমন- প্রায় জুমু'আর দিন দেখা যায়। একটি হাদীসে রয়েছে যে, একজন লোক ষাট বছর সলাত আদায় করবে। অথচ তার সলাত হবে না। কেউ জিজ্ঞেস করল, তা কেমন করে? তিনি (ﷺ) বললেন : সে রুকূ' পুরো করে তো সাজদাহ্ পুরো করে না এবং সাজদাহ্ ঠিক দেয় তো রুকূ' ঠিক দেয় না। অন্য এক হাদীসে আছে যে, একবার বিখ্যাত সহাবী হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঐরূপ সলাতে রুকূ'-সাজদাহ্ পূর্ণ না-কারী একজন মুসল্লীকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এরূপ সলাত কয় বছর ধরে আদায় করছ? সে বলল, চল্লিশ বছর। হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তাহলে তুমি সলাতই আদায় করনি। অতএব, তুমি যদি ঐ অবস্থায় মারা যেতে তাহলে ইসলামী প্রকৃতির বিপরীত প্রকৃতিতে নিশ্চয়ই মরতে।[৬]

সুতরাং মুরগীর কুড়ো খাওয়ার মতো সলাত আদায় করলে সলাতের সুফল পাওয়া যাবে না। তাই ধীরে সুস্থে ও ভীত-বিনয়চিত্তে (খুশু-খুযু সহকারে) সলাত আদায় করতে হবে। এ খুশু বা ভীতচিত্তের গুরুত্ব সম্পর্কে বিখ্যাত তাবি'ঈ-বিদ্বান ইমাম সুফ্ইয়ান সাওরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তি সলাতে খুশু করে না এবং মহান আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না, তার সলাত নষ্ট হয়ে যায় এ ব্যাপারে হাসান বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে সলাতে মন হাজির থাকে না তা পুণ্যের তুলনায় শাস্তিকেই দ্রুত টেনে আনে।[৭]

এছাড়াও প্রায় শতকরা নব্বইজন লোকই না বুঝে সলাত আদায় করে। তাই তাদের অধিকাংশই সলাতের স্বাদ পায় না। ফলে সলাতে তাদের মন বসে না এবং খুশুর ভাব ফুটে উঠে না। অথচ না বুঝে পড়লে কী ক্ষতি হয় তাও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখ থেকে শুনুন। তিনি (ﷺ) বলেন : মহান আল্লাহর বান্দা তার সলাতের অতটুকু অংশ পাবে যতটা সে ওর মধ্যে বুঝে থাকে।[৮]

এ হাদীসটি অন্য শব্দে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তুমি তোমার সলাতের মধ্যে অতটুকু পাবে যতটুকু তুমি বুঝে পড়বে। এর ব্যাখ্যায় হাফিয ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, কোনো সলাত আদায়কারী তার সলাতের যে

---

[১] *সুনান আন্-নাসায়ী- হা. ৪৬৬, সহীহ।*
[২] *ত্বরানী।*
[৩] *সূরা আল-'আনকাবূত : ৪৫।*
[৪] *তাফসীর ইবনু কাসীর- ড. মু. মুজীবুর রহমান, ৩য় খণ্ড, ৫৮৪ পৃ.।*
[৫] *কিতাবুস সলাত ওয়ামা-য়্যালাযামু ফীহা- ৫ম খণ্ড, পৃ.।*
[৬] *ঐ- ৩৩ পৃ.।*
[৭] *আত্ তা'লিকুস সাবীহ- ১ম খণ্ড, ২৬৬ পৃ.।*
[৮] *এহইয়া-উল উলুম, মিফতাহুস সাআ-দাহ, সলাত কি হাক্বীক্বাত- ৮০ পৃ.।*

অংশটা বুঝে পড়বে সে কেবল ঐ অংশ অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। যদিও এর দ্বারা তার সলাত আদায় করার দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে।[১]

উক্ত বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, সাধ্যমত বুঝে-সুঝে সলাত আদায় করতে হবে। সেজন্য সলাতের নিয়ম-কানুন ভালো করে শিখতে হবে এবং সূরা ও দু'আগুলোর অর্থও জানার চেষ্টা করতে হবে। অতএব অর্থ না বুঝে সলাত আদায় করা ওর সুফল না পাবার আরো একটি কারণ।

মহান আল্লাহর 'ইবাদত করে গর্বিত হওয়া আপত্তিকর কাজ। তাই সলাত আদায় করে আত্মগর্ব করা সলাতের সুফল না পাবার একটি বিশেষ কারণ। সুতরাং কোনো সলাত আদায়কারী যেন আত্মগর্বী না হন; বরং বিনয়ী ও নম্র হন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সলাতের সুফল পাবার তাওফীক্ব দিন –আমীন।[২]

সলাত শেষে একান্তভাবে মহান আল্লাহকে ডাকা

বান্দাহ যত বেশি মহান আল্লাহর একান্ত বাধ্যগত হবে তার কাছে সব সময় অবনত হয়ে থাকবে তার নিকটবর্তী হবে। রাসূল (ﷺ) বলেন : "বান্দাহ সিজদারত অবস্থায় তার রবের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয়। সুতরাং তোমরা বেশি বেশি দু'আ করো।"[৩]

কেননা সিজদারত অবস্থায় বান্দাহ বেশি অনুগত থাকে যখন বান্দাহ তার মস্তককে মাটিতে মিশিয়ে রাখে তখনই তার রবের বেশি নিকটবর্তী হয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় এক দু'আর কথা উল্লেখ করেছেন : "আপনার ইজ্জতের মাধ্যমে আমি প্রার্থনা করছি। আপনার রহমাত ব্যতীত আমার অপমান থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই। আমি আপনার শক্তির দ্বারা আমার দুর্বলতা দূর করতে চাই। আপনার মুখাপেক্ষীহীনতার মাধ্যমে আমার দারিদ্রতা দূর করতে চাই। আমার এই মিথ্যুক কপাল আপনার সমানে লুণ্ঠিত। আমি ছাড়াও আপনার অনেক বান্দাহ রয়েছে, কিন্তু আপনি ছাড়া আমার আর কোনো আশ্রয়স্থল ও পরিত্রাণ নেই। আমি আপনার নিকট মিসকিনের মতো ভিক্ষা চাচ্ছি। অনুগতের মতো কাতর প্রার্থনা করছি। ভীতু সন্ত্রস্তের মতো ডাকছি। যে আপনার নিকট ভয়ে তার পা নিচু করেছে, নাক ধুলায় ধুসরিত করেছে, যার চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে এবং আপনার ভয়ে যার অন্তর কেঁপে উঠেছে।" যখন বান্দাহ এ ধরনের বাক্য দ্বারা মুনাজাত করবে তখন তার অন্তরে ঈমান অবশ্যই অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে।

সলাতে বিনয় ও নম্রতার গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾

"ঈমানদারগণ পরিত্রাণ পেয়ে গেছে। যারা নিজেদের সলাতে বিনয়ী নম্র।"[৪]

﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

"আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদাবের সাথে দাঁড়াও।"[৫]

এ আয়াতের মর্ম হচ্ছে– দীর্ঘ রুকূ', বিনয়-নম্রতা, দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা এবং মহান আল্লাহর ভয়ে নত হওয়া। সলাতে নম্রতা তারাই অর্জন করতে পারে যারা অখণ্ড মনে সেটি আদায় করে, সলাত আদায়কালে একাগ্রচিত্তে থাকে এবং অন্য সবকিছুর উপর সলাতকে প্রাধান্য দেয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাদের গুণাবলীতে বিনয়-নম্রতা অবলম্বনকারী নারী-পুরুষের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এ কথারও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাদের জন্য ক্ষমা ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের জন্য পাঁচবারের সলাত ফার্‌য করেছেন। যে ব্যক্তি এগুলো আদায় করবে এগুলোর প্রতি শিথিলতা দেখিয়ে এগুলো নষ্ট করবে না, তার জন্য মহান আল্লাহর নিকট এ অঙ্গীকার রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

বিশ্বনবী (ﷺ), সহাবায়ি কিরাম ও পূর্ববর্তীদের সলাত আদায়ের চিত্র

১. রাসূল (ﷺ) ইবনু হিব্বান সহীহ সনদে 'আত্বা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি এবং উবায়দুল্লাহ ইবনু 'উমাইর 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট গেলাম। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আপনি আমাদের নিকট এক আশ্চর্যজনক হাদীস বর্ণনা করুন যা আপনি রাসূল (ﷺ)-কে করতে দেখেছেন। তখন তিনি কেঁদে দিলেন এবং বললেন, এক রাতে তিনি সলাতে দাঁড়িয়ে বললেন : হে 'আয়িশাহ্! তুমি আমাকে আজ ছেড়ে দাও আমি আমার রবের 'ইবাদত করি। তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি আপনার সঙ্গ ভালোবাসি এবং আপনি যাতে খুশি হন তা পছন্দ করি। অতঃপর তিনি ওযূ করলেন এবং

[১] *আস্ সলাতু ওয়াআহকামু তারিকিহা।*
[২] *সূত্র : আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা- ১ম খণ্ড, হাদীস একাডেমী ছাপা, ২০৭-২০৯ পৃ.।*
[৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪৮২।*
[৪] *সূরা আল-মু'মিনূন : ১-২।*
[৫] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২৩৮।*

সলাতে দাঁড়ালেন। সলাতে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাপড় ভিজে গেল। এমন কি কাঁদতে কাঁদতে সামনের মাটি পর্যন্ত ভিজে গেলো। ইত্যবসরে বিলাল এসে ফজরের আযান দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। যখন তিনি তাঁকে কাঁদতে দেখলেন, তখন বললেন, হে আল্লাহ! হে রাসূল! আপনি কাঁদতে অথচ আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বের এবং পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন : আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দাহ হব না! আজকে এ রাত্রিতে আমার উপর এক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তার জন্য ধ্বংস যে তা পাঠ করবে অথচ তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে না।

মুতার্‌রিফ তাঁর পিতা হতে– তিনি বলেছেন : আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে সলাত (এমন বিনয়ের সাথে) আদায় করতে দেখেছি যে, সলাতের মধ্যে তাঁর (মহান আল্লাহর ভয়ে) কান্নার ফলে তাঁর বুক থেকে হাঁড়ির ফুটন্ত পানির গড়গড় শব্দের ন্যায় শব্দ হত।[১]

সলফে সলিহীনের 'ইবাদতের কথা এবং তাদের 'আমলের কথা আলোচনা করতে গেলে সত্যিই আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। তারা অনেকেই সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করতেন। রাত্রি জেগে জেগে তাহাজ্জুদ পড়তেন, এমনকি যুদ্ধের রাত্রের রাত্রি জেগে জেগে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাহাজ্জুদ সলাত আদায় করতেন। জেলখানায় বন্দী থেকেও এমনকি পায়ে শিকল বাঁধা থাকলেও রাত্রি জেগে জেগে তাহাজ্জুদ পড়তেন। তাদের গণ্ডদেশ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ত। তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করতেন। তারা অনেকেই নিজের স্ত্রীকে ফাঁকি দিতেন, যেমন- ছোট বাচ্চা তার মাকে ফাঁকি দেয়। যখন দেখতেন যে, তার স্ত্রী ঘুমিয়ে গেছে তখন বিছানা থেকে উঠে গিয়ে সলাতে দাঁড়িয়ে পড়তেন। তারা রাত্রিকে ভাগ করে নিতেন নিজের আত্মার জন্য এবং পরিবারের জন্য। আর দিনের বেলায় সলাতের জন্য, ইসলামী জ্ঞানার্জনের জন্য। জানাযার অনুসরণ, পীড়িতের সেবা-শুশ্রূষা এবং লোকদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য সময় ব্যয় করতেন। তাঁদের অনেকেই বছরের পর বছর ধরে জামা'আতে তাকবীরে তাহরীমায় উপস্থিত থাকতেন। তাঁদের তাকবীরে তাহরীমা কখনও ছুটে যেত না। তাঁদের অন্তঃকরণ সর্বদা মসজিদের সাথে লটকানো থাকত। সলাত আদায় করে আসার পর আবার সলাতের জন্য অপেক্ষা করতেন। অনেকেই তাঁর মৃত দ্বীনি ভাইয়ের পরিবারের জন্য বছরের পর বছর খরচ চালিয়ে যেতেন।

২. 'উমার ইবনু আল-খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মিম্বারে বলেছিলেন, ইসলাম ধর্মে মানুষ বৃদ্ধ হয়ে যায় অথচ সে মহান আল্লাহর উদ্দেশে পরিপূর্ণভাবে সলাত আদায় করেনি। বলা হয়েছিল, কীভাবে? তিনি বলেছিলেন, সলাতে পরিপূর্ণ বিনয়-নম্রতা (খুশু-খুযু) অবলম্বন করে না। মহান আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে না।

এটি ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'উমার ইবনু আল-খাত্ত্বাবের একটি উক্তি। আমাদের আজকের অবস্থা কী? আল্লাহ তা'আলা যাদের প্রতি দয়া করেছেন তারা ছাড়া অধিকাংশের অবস্থায়ই শোচনীয়। তারা সশরীরে সলাত আদায় করে কিন্তু তাদের মন পড়ে থাকে দুনিয়া ও বাজার বিপণীতে। বেচা-কেনা করে। হ্রাস-বৃদ্ধি করে। এটি উদাসীনতার ফল ব্যতীত আর কিছু নয়।

৩. আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র নাতি 'আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খুশু সম্পর্কে তাবি'ঈ মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনু যুবায়র যখন সলাতে দাঁড়াতেন তখন খুশুর কারণে তাকে একটি কাঠ মনে হত। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আস্‌সার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনু যুবায়র যখন সাজদাহ্ দিতেন তখন চড়ুই পাখীরা তাঁর পিঠে নেমে আসতো এবং তারা মনে করতো যে, এটা কোনো দেয়ালের খুঁটি।[২]

একদিন সলাত আদায়রত অবস্থায় ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু নাস্‌র মারআযীর কপালে একটি বোলতা কামড়ে রক্ত বের করে দেয়। তবুও তিনি একটু নড়াচড়া করেননি।[৩]

৪. ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসে এসেছে বিখ্যাত তাবি'ঈ ইবনু সীরীন যখন সলাতে দাঁড়াতেন তখন মহান আল্লাহর ভয়ে তাঁর চেহারার রক্ত শুকিয়ে যেত।[৪]

৫. ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) এক রাতে সলাত আদায় করছিলেন। তাঁকে সতেরবার বোলতা কামড়ে নিলো। সলাত শেষ করে তিনি বললেন, দেখো তো আমাকে কিসে কষ্ট দিলো। মায়মূন ইবনু হাইয়্যান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুসলিম ইবনু ইয়াসারকে কখনো সলাতে সামান্য পরিমাণও এদিক-সেদিক

[১] *সুনান ইবনু মাজাহ; বুলূগুল মারাম, হা. ২৩৭।*

[২] *সিফাতুস সফ্‌অহ- ১ম খণ্ড, ৩২২ পৃ.।*

[৩] *তাযকিরাতুল হুফফায- ২য় খণ্ড, ৬৫২ পৃ.; সিফাতুস সফ্‌অহ- ৪র্থ খণ্ড, ১২২ পৃ.; সূত্র : আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা- ঐ, ২০৭ পৃ.।*

[৪] *কিতাবুস সলাত ওয়ামা-য়্যালযামু ফীহা- ২০ পৃ.।*

দৃষ্টিপাত করতে দেখিনি। একবার মসজিদের এক কোণ ধ্বসে পড়েছিল, বাজারের লোকেরা ভীত হয়ে পড়ল। অথচ তিনি মসজিদেই সলাত আদায় করছিলেন। এদিক-সেদিক তাকাননি।

৬. আবূ বাক্র ইবনু আইয়্যাশ (রহিমাহুল্লাহ)। তিনি বলেন, হাবীব ইবনু আবূ সাবিতকে সাজদাহ্ করতে দেখলাম। তাকে দেখলে আপনি বলতেন, মৃত মানুষ। ইবনু ওয়াহাব বলেছেন, সাওরীকে মাগরিবের পর হারামে দেখতে পেলাম। তিনি সলাত আদায় করলেন এরপর দীর্ঘ সাজদাহ্ করলেন। 'ইশার আযান না হওয়া পর্যন্ত তিনি মাথা উঠালেন না। কোনো কিছুই তাদের সলাত থেকে বিমুখ করতে পারত না। আল্লাহ ও তাদের মাঝে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকত না, তাদের সবটুকু মনোযোগ থাকত সলাতের প্রতি। মহান আল্লাহর নিকট বিনয়-নম্রতার প্রতি, তাঁর সম্মুখে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার প্রতি।

৭. খালাফ ইবনু আইয়ূবকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। মাছি আপনাকে সলাতে কষ্ট দিলে আপনি কি ওটিকে তাড়িয়ে দেন না? তিনি বললেন, আমার সলাত বিনষ্ট করবে এমন কোনো কিছুর প্রতি আমি মনকে সংযোগ করি না। কীভাবে ধৈর্য ধারণ করেন? আমি জানতে পেরেছি, ফাসিক্বরা বাদশার বেত্রাঘাতে ধৈর্য ধারণ করে। তখন বলা হয়– অমুক ব্যক্তি ধৈর্যশীল। এ নিয়ে তারা গর্ব করে। অপরদিকে আমি আমার রবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি। আমি কী করে একটি মাছির কারণে নড়াচড়া করতে পারি?

৮. হাতিমুল আসাম্ম (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত; তাঁকে তাঁর সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, সলাতের সময় হলে পরিপূর্ণভাবে ওযূ করি। যেখানে সলাত আদায় করার ইচ্ছে করি সেখানে যাই। তারপর সলাতে দাঁড়াই। আমার ভ্রুর সম্মুখে কাবা ঘরকে রাখি। পুলসিরাতকে আমার দু' পায়ের নিচে রাখি। জান্নাতকে রাখি আমার ডান পাশে ও জাহান্নামকে বাম পাশে। মৃত্যুর মালাককে (ফেরেশ্তাকে) পেছনে। এটিকে আমি আমার জীবনের শেষ সলাত মনে করি। তারপর আশা ও ভয়ের মাঝে দাঁড়াই। তাকবীর ধ্বনি দিই। ধীরে ধীরে কুরআন পড়ি। বিনয়-নম্রতার সাথে রুকূ' করি। ভক্তির সাথে সাজদাহ্ করি। বাম নিতম্ব ভরে বসি। পায়ের উপরিভাগ বিছাই। বুড়ো আঙ্গুলের উপর ডান পা খাড়া রাখি নিখাদ নির্ভেজাল চিত্ত হওয়ার চেষ্টা করি জানি না সলাত ক্ববূল হলো কি-না![১]

[১] *যাও আবার নামায পড়ো? তোমার নামায হয়নি!- ৩-৭ পৃ.।*

সলাতে বিনয়-নম্রতা অবলম্বনের উপায়

(১) মহান আল্লাহর 'ইবাদতে, প্রভুত্বে, তাঁর নাম ও গুণাবলীতে তাঁকে এক ও একক সত্ত্বা বলে মানা। **(২)** মহান রবকে সম্মান করা, তাঁর জন্য মনকে নিখাদ করা, প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁর ধ্যান করা। **(৩)** আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে সঠিকভাবে অনুসরণ করা। **(৪)** মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা এবং নিষেধ থেকে বিরত থেকে তাঁর ভয় করা। **(৫)** হালাল পবিত্র দ্রব্য পানাহার করা, হারাম দ্রব্যাদি থেকে দূরে থাকা এবং সন্দেহযুক্ত বিষয়াদিও দ্রব্যাদি থেকে বিরত থাকা। **(৬)** বিনয়-নম্রতা অবলম্বনকারীদের সাহচর্যে থাকা। **(৭)** সলাতে প্রবেশ করার পূর্বে মনোযোগী ও একাগ্রচিত্তে হওয়া। **(৮)** সলাতের পরিপূর্ণ সাওয়াব পাওয়ার আশা করা। **(৯)** উত্তমরূপে ওযূ করা, গোড়ালি শুকনো না রাখা এবং পানির অপচয় না করা। **(১০)** সলাতে প্রবেশ করার পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ ও সলাতের স্থানও প্রস্তুত রাখা। **(১১)** জামা'আতে সলাত আদায়ে মনোযোগী হওয়া এবং আযানের পরই সেদিকে ধাবিত হওয়া। **(১২)** সলাতে যে সকল সূরা ও দু'আ পড়া হয় সেগুলোর অর্থ নিয়ে চিন্তা করা। **(১৩)** সলাতে তাড়াহুড়া না করা। এদিক-সেদিক না তাকানো। **(১৪)** ইমামের অনুসরণ করা, কেননা অনুসরণ করার উদ্দেশেই ইমামকে নিযুক্ত করা হয়েছে। **(১৫)** সলাতে ভালো পোশাক পরিধান করা। জাগতিক কাজ-কর্ম থেকে মনকে মুক্ত করা। **(১৬)** যে সকল স্থানে বাদ্যযন্ত্র বাজছে, হৈ চৈ হচ্ছে, মনোযোগ নষ্ট হচ্ছে, সেখানে সলাত আদায় না করা। **(১৭)** এমনভাবে সলাত আদায় করা যেন দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করছি। **(১৮)** তামাকজাত দ্রব্য তথা বিড়ি, সিগারেট বর্জন করা।

সলাতের ক্ষতিকর কাজসমূহ

১) কাতার সোজা না করা। টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করে সলাত আদায় করা। সলাত আদায়রত অবস্থায় চোখ বন্ধ রাখা। **২)** মানসিক প্রশান্তি না থাকা। খুব দ্রুত সলাত আদায় করা। কাকের মতো ঠোকরানো। **৩)** রুকূ', সাজদাহ্ ইত্যাদি ইমামের আগে আগে করা। **৪)** সলাতে কাপড় ঠিক করা, দাড়ি নিয়ে বৃথা খেলা করা, নকশা ও কারুকার্যে চোখ ফেরানো। সলাতে এদিক-সেদিক তাকানো এবং আকাশের দিকে চোখ তোলা। সলাতে মনোসংযোগ না থাকা। **৫)** সলাতরত অবস্থায় দুনিয়াবী বিষয় স্মরণ করা এবং নানা বিষয় নিয়ে কল্পনা করা। **৬)** হাই উঠলে হাত দিয়ে বন্ধ না করা। **৭)** মদ, সিগারেট, রসুন ও পিঁয়াজ খেয়ে মসজিদে সলাত আদায় করা ইত্যাদি।

সাহাবাচরিত :

সাহাবী বিলাল ইবনু রাবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) : ঈমান ও মানবিক মর্যাদার প্রতীক

আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী*

ভূমিকা : ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে সাহাবায়ে কিরামের জীবন কেবল ঘটনাবলির সমষ্টি নয়; বরং তা ‘আক্বীদাহ্, নৈতিকতা ও মানবিক সাম্যের বাস্তব প্রয়োগ। সাহাবী বিলাল ইবনু রাবাহ আল-হাবাশী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তেমনই এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, যাঁর জীবন সালাফে সালেহীনের নিকট তাওহীদে অটলতা, ধৈর্য এবং আল্লাহভীতির সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত। তাঁর জীবন প্রমাণ করে যে, ইসলামে মর্যাদার মানদণ্ড বংশ, বর্ণ বা সামাজিক অবস্থান নয়; বরং ঈমান ও তাক্বওয়া।

১. পরিচয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট : বিলাল ইবনু রাবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন হাবশী (আফ্রিকান) বংশোদ্ভূত। তাঁর পিতা রাবাহ ও মাতা হামামা উভয়েই দাস ছিলেন। তিনি মক্কার কুরাইশ নেতা উমাইয়াহ্ ইবনু খালাফের অধীনে দাসত্বে ছিলেন।

ইবনু সা‘দ (মৃ. ২৩০ হি.) আত্-তাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সামাজিকভাবে ছিলেন নিপীড়িত শ্রেণিভুক্ত, কিন্তু ইসলাম তাঁকে আত্মিক স্বাধীনতা ও সম্মান দান করে।

ইমাম যাহাবী (মৃ. ৭৪৮ হি.) সিয়ারু ‘আলামিন নুবালা-তে তাঁকে “তাক্বওয়া ও সত্যবাদিতার প্রতীক” হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

২. ইসলাম গ্রহণ : বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন ইসলাম গ্রহণ মানেই ছিল কঠোর নির্যাতন ও সামাজিক বর্জনের মুখোমুখি হওয়া।

ইবনু কাসীর (মৃ. ৭৭৪ হি.) আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া গ্রন্থে তাঁকে আস-সাবিকুনাল আউয়ালুন (প্রথম দিককার মুসলমানদের) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সালাফগণ একমত যে, তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল নিছক আবেগ নয়; বরং সচেতন ঈমানি সিদ্ধান্ত।

৩. নির্যাতন ও তাওহীদের ঘোষণা : ইসলাম গ্রহণের পর বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। তাঁকে মক্কার উত্তপ্ত বালির ওপর শুইয়ে বুকের ওপর ভারী পাথর চাপিয়ে দেওয়া হতো।

এই অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে যে বাক্য উচ্চারিত হতো তা ছিল– “আহাদ, আহাদ”, (আল্লাহ এক, আল্লাহ এক)।

ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (মৃ. ৭২৮ হি.) এই ঘটনাকে তাওহীদের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বিলালের এই উচ্চারণ শির্কী সমাজের বিরুদ্ধে ঈমানের সুস্পষ্ট ঘোষণা।

ইবনুল কাইয়্যিম (মৃ. ৭৫১ হি.) মন্তব্য করেন, “শরীর যখন পরাজিত হয়, তখন ঈমান বিজয়ী হয়।”

৪. মুক্তি ও ইসলামী সাম্যবোধ : আবূ বক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ক্রয় করে মুক্ত করেন।

সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত আছে, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন– “আমাদের নেতা আবূ বক্র, তিনি আমাদের নেতা বিলালকে মুক্ত করেছেন।”[১]

এই বক্তব্য সালাফদের কাছে ইসলামী সাম্য ও মানবিক মর্যাদার এক শক্তিশালী দলিল।

৫. জান্নাতের সুসংবাদ ও ব্যক্তিগত ‘আমল : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। সহীহুল বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে এসেছে– “হে বিলাল! তুমি আমাকে জানাও, এমন কোনো ‘আমল করো যার কারণে আমি জান্নাতে তোমার জুতার আওয়াজ শুনেছি।”

বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তিনি প্রত্যেক ওযূর পর দুই রাক‘আত নফল নামায আদায় করতেন।

---

* *সহযোগী সাংগঠনিক সেক্রেটারি, কেন্দ্রীয় জমঈয়ত।*

[১] *সহীহুল বুখারী।*

ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬ হি.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এটি গোপন নফল 'ইবাদতের ফযীলাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৬. ইসলামের প্রথম মুয়ায্যিন : বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়ায্যিন। তাঁর কণ্ঠে প্রতিদিন উচ্চারিত হতো তাওহীদের ঘোষণা।

ইবনু হাজর আল-আসকালানী (মৃ. ৮৫২ হি.) ফাতহুল বারী-তে বলেন, রাসূল (ﷺ) তাঁকে আযানের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁর ঈমান, আমানতদারিতা ও দৃঢ় কণ্ঠের কারণে।

৭. রাসূল (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর জীবন : রাসূল (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পর বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আর নিয়মিত আযান দিতে পারেননি। নবী (ﷺ)-এর নাম উচ্চারণ করলেই তিনি আবেগে ভেঙে পড়তেন।

ইবনু সা'দ উল্লেখ করেন, এরপর তিনি মদিনা ত্যাগ করে শামে চলে যান এবং সেখানে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।

৮. ইন্তিকাল : ২০ হিজরির কাছাকাছি সময়ে দামেস্কে তাঁর ইন্তিকাল হয়। মৃত্যুশয্যায় তাঁর শেষ কথা ছিল– "আগামীকাল আমরা প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত হব, মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর সাথীদের সঙ্গে।"

ইমাম যাহাবী একে ঈমানদারের মৃত্যুর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

উপসংহার : সালাফে সালেহীনের বর্ণনায় বিলাল ইবনু রাবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কেবল একজন সাহাবী নন; বরং তিনি ইসলামের মানবিক দর্শন, তাওহীদের শক্তি এবং তাক্বওয়ার মর্যাদার জীবন্ত প্রতীক। তাঁর জীবন শিক্ষা দেয়– মহান আল্লাহর কাছে মানুষ চেনা হয় ঈমান ও 'আমলের দ্বারা, পরিচয় বা বংশের দ্বারা নয়।

রেফারেন্স : ১. আত্-তাবাকাতুল কুবরা- ইবনু সা'দ, **২.** আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া- ইবনু কাসীর, **৩.** সিয়ারু 'আলামিন নুবালা- ইমাম যাহাবী, **৪.** ফাতহুল বারী- ইবনু হাজর আল-আসকালানী, **৫.** সহীহুল বুখারী, **৬.** সহীহ মুসলিম, **৭.** মাজমু' ফাতাওয়া- ইবনু তাইমিয়্যাহ, **৮.** মাদারিজুস সালিকীন- ইবনুল কাইয়্যিম।

আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল শহীদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মাসআলা কুরআন ও হাদীস থেকে সাব্যস্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান কোনো মুজতাহিদ বা ইমামের অনুসরণ করতে পারে কিন্তু তাকে (এ অবস্থায়) প্রকৃত সমাধান লাভের প্রচেষ্টায় রত থাকতে হবে, তাকলীদের উপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে বসে থাকলে চলবে না। অতঃপর যদি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সে মাসআলায় মুজতাহিদ বা ইমামের অভিমত বিরোধী সাব্যস্ত হয় তবে তাকলীদ করা হারাম হবে এবং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী 'আমল করা ফর্‌য হয়ে পড়বে। আর তাকলীদ হলো কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই কারো কথা মেনে নেয়া এবং এই কথার পিছনে যুক্তি ও দলিল সমন্ধে জিজ্ঞাসা না করা। *[তাকভিয়াতুল ঈমান]*

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি) বলেন,

দুনিয়াতে কোনো 'ইজম'ই মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। কারণ দুনিয়ার এক এক দেশে এক এক প্রকারের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে। সবাই দাবি করেন যে, তাঁরা সেবক। অথচ পূর্ব-পশ্চিমের ডিমোক্রেসির মধ্যে কত তফাৎ। মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থা সমস্যার সত্যিকার সমাধান দিতে পারে না। কেননা মানুষের সৃষ্ট ব্যবস্থা পরিবর্তনশীল। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের বিধান অপরিবর্তনীয়। তাকে কোনো কন্সটিটুয়েথীকে সন্তুষ্ট করতে হয় না, কোনো ব্যক্তিকে তুষ্ট করতে হয় না, কোনো স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে তিনি আবদ্ধ নন। তাঁর সংবিধানের কোনো এ্যামেন্ডমেন্ট এর প্রয়োজন হয় না। তাঁর দেয়া জীবন-বিধান আল কুরআন সকল যুগের, সকল জাতির জন্য শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। *(অভিভাষণ- ৯৬ পৃ.)*

ক্বাসাসুল কুরআন :

রাসূল (ﷺ)-এর এক বিস্ময়কর ভ্রমণ

আবু তাহসীন মুহাম্মদ

মি'রাজ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের এক অনন্য মু'জিযাহ্। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এক একজন নবী রাসূলকে তাদের পদমর্যাদা অনুসারে পৃথিবী ও আকাশের অদৃশ্য রাজত্ব দেখিয়ে দিয়েছেন এবং বস্তুগত অন্তরালের পর্দা সরিয়ে দিয়ে চর্ম চক্ষু দিয়ে এমন সব জিনিস প্রত্যক্ষ করিয়েছেন, যে গুলোর উপর ঈমান বিল গায়েব আনার জন্য তাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। এভাবে একজন দার্শনিক, যিনি আন্দাজ অনুসারের ভিত্তিতে কথা বলেন, তার মর্যাদা থেকে একজন নবীর মর্যাদা পৃথক হয়ে যায়, কারণ নবীগণ যা বলেন তা চাক্ষুষ দর্শনের ও সরাসরি জ্ঞানের ভিত্তিতে বলেন। কাজেই তারা জনগণের সামনে এই মর্মে সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, তারা এসব কথা জানেন ও এ সব কিছু তাদের স্বচক্ষে দেখা জলজ্যান্ত সত্য। আল্লাহ পবিত্র আল কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

"মহাপবিত্র মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি আপন বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারদিক আমি বরকত দিয়ে ভরে রেখেছি। যাতে আমি তাঁকে আমার কুদরতের কিছু নির্দশন দেখিয়ে দিই। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু দেখেন।"[৮৭]

মি'রাজ বিশ্বনবী (ﷺ) এর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এটি এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল যখন মুসলমানদের উপর চলছিল চরম নির্যাতন। সে সময় এ ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তার এ দ্বীনকে আরো সফলতার দিকে নিয়ে গিয়েছেন এ মি'রাজ রজনীতেই মানব জাতির শ্রেষ্ঠ 'ইবাদত পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফর্য হয় আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী অবস্থার প্রতিকুলতা এবং এরই মাঝে মি'রাজের সফলতার দিকে ইঙ্গিত করে উল্লেখ করেছেন– অর্থাৎ- একদিকে নবী (ﷺ)-এর দা'ওয়াতী কাজের সফলতা, আর অন্যদিকে নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতনের চরম পর্যায় অতিক্রান্ত হচ্ছিল, এ দু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থায় দূর দিগন্তে মিটমিট করে জ্বলছিল তারকার মৃদু আলো, এমনি সময়ে মি'রাজের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল।

মসজিদে-হারাম ও মসজিদে-আকসা : আবূ যর গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে-হারাম। অতঃপর আমি আরজ করলাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এতদুভয়ের নির্মাণের মধ্যে কতদিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। তিনি আরো বললেন, এ তো হচ্ছে মসজিদদ্বয়ের নির্মাণক্রম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাযের সময় হয়, সেখানেই নামায পড়ো।[৮৮]

তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহর স্থানকে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভিত্তিপ্রস্তর সপ্তম জমিনের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। মসজিদে আকসা সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) নির্মাণ করেছেন।[৮৯]

বায়তুল্লাহর চারপাশে নির্মিত মসজিদকে মসজিদে-হারাম বলা হয়। মাঝে মাঝে সমগ্র হারামকেও মসজিদে হারাম বলে দেয়া হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে দু'টি রিওয়ায়াতের এ বৈপরীত্যও দূর হয়ে যায় যে, এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মে হানীর গৃহ থেকে ইসরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান এবং অন্য এক রিওয়ায়াতে কা'বার হাতীম থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। মসজিদে হারামের শেষোক্ত অর্থ নেয়া হলে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি প্রথমে উম্মে হানীর গৃহে ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে কা'বার হাতীমে আগমন করেন এবং সেখান থেকে সফরের সূচনা হয়।

মসজিদুল হারাম হতে মসজিদে আকসা ভ্রমণের পথে শিক্ষণীয় ঘটনা : ইমাম বাযযার ও আবূ ইয়া'লা এবং ইবনু জারীর ও মুহাম্মাদ ইবনু জারীর ও মুহাম্মাদ ইবনু নাসর মারঅযী তাঁর কিতাবুস সলাতে আর ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু মারদোয়াহে প্রমুখ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বর্ণনায় মি'রাজের বৃত্তান্ত বর্ণনাকরতঃ বলেন, বুরাকে চড়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মক্কা থেকে সফর শুরু করেন তখন তিনি এমন একটি সম্প্রদায়ের উপর দিয়ে যান, যারা একদিনে চাষ করছে এবং ঐ একদিনেই ফসল কাটছে। যখন তারা তা কাটছে তখনই তা আবার তৈরিও হয়ে যাচ্ছে। তাই নবী (ﷺ) বলেন, হে জিবরা-ঈল! এরা কে? তিনি বলেন, এরা আল্লাহর রাহে জিহাদকারী। এদের নেকীগুলো সাতশো গুণ

[৮৭] *সূরা বানী-ইসরা-ঈল : ১।*

[৮৮] *সহীহ মুসলিম।*

[৮৯] *সুনান আন্ নাসায়ী; তাফসীরে কুরতুবী- ৪/১২৭ পৃ.।*

করা হচ্ছে। আর এরা যেসব জিনিস খরচ করেছে তারই বদলা আল্লাহ তাদেরকে দিচ্ছেন।

তারপর তিনি (ﷺ) ভ্রমণে একটি সম্প্রদায়ের কাছে এলেন যাদের মাথাগুলো পাথর দিয়ে চুরমার করে দেয়া হচ্ছে। যখনই তা-চুরমার হয়ে যাচ্ছে তখনই তা আবার তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আর ঐ কাজ থেকে তাদের বিরাম নেই। তাই তিনি (ﷺ) বললেন, এরা কারা হে জিবরা-ঈল! তিনি বললেন, এরা তারা, যারা নামাযের পরোয়া করতো না।

তারপর তিনি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে এলেন, যাদের সামনে একটি হাঁড়িতে রাঁধা গোশ্ত এবং অন্য হাঁড়িতে পচাসড়া গোশ্ত রয়েছে। অতঃপর তারা পচাসড়া মাংসটা খাচ্ছে এবং রাঁধা পবিত্র মাংসটা ছেড়ে দিচ্ছে। আমি বললাম, এরা কারা, হে জিবরা-ঈল? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের সেই ব্যক্তি যার কাছে হালাল (বিয়ে করা) স্ত্রী আছে। তথাপি সে নাপাক নারীর কাছে আসে। অতঃপর সকাল পর্যন্ত তার কাছে রাত কাটায়। তেমনি সেই নারী যার কাছে হালাল স্বামী আছে। অথচ সে নাপাক পুরুষের কাছে আসে। অতঃপর সকাল পর্যন্ত তার কাছে রাত কাটায়। তারপর তিনি একটি পাথরের কাছে এলেন, যা পথের উপরেই ছিল। অতঃপর ওর পাশ দিয়ে যে কাপড়ই অতিক্রম করছিল সেটাকে তা ছিঁড়ে ফেলছিল। তিনি (ﷺ) বললেন, এটা কী? হে জিবরা-ঈল! তিনি বলেন, এটা আপনার উম্মতের সেই সম্প্রদায়গুলোর উদাহরণ যারা রাস্তায় বসে, অতঃপর তারা ডাকাতি ও রাহাযানী করে।

তারপর তিনি একটি সম্প্রদায়ের কাছে এলেন, যারা কাঠের একটা বিরাট বোঝা জড় করে রেখেছে, যা সে বইতে পারছে না। অথচ তার উপরে সে আরো বোঝা চাপাচ্ছে। তাই তিনি (ﷺ) বললেন, এরা কারা, হে জিবরা-ঈল? তিনি বলেন, এরা আপনার উম্মতের এমন লোক, যাদের কাছে লোকেদের আমনত জমা রয়েছে। সেগুলোকে সে আদায় করতে পারছে না। অথচ সে ওর উপরে আরো বোঝা চাপাচ্ছে।

তারপর তিনি এমন একটি সম্প্রদায়ের কাছে এলেন, যাদের জিভগুলো ও ঠোঁটগুলো জাহান্নামের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। তা যখনই কাটা হচ্ছে তখনই সেটা আবার তৈরি হয়ে যাচ্ছে। যেমন- তা ছিল। তা থেকে তাদের বিরাম দেয়া হচ্ছে না। তিনি (ﷺ) বললেন, এরা কারা, হে জিবরা-ঈল? তিনি বললেন, এরা ফিতনাবাজ বক্তা।

তারপর তিনি একটি ছোট্ট পাথরের কাছে এলেন, যার ভেতর থেকে একটা বিরাট বড় বলদ বের হচ্ছে। তারপর ঐ বলদটি ওর মধ্যে ফিরে যেতে চাইছে সেখান থেকে সে বের হয়েছিল। কিন্তু সে তা করতে সক্ষম হচ্ছে না। তাই তিনি (ﷺ) বললেন, এটা কী? হে জিবরা-ঈল! তিনি বলেন, এই ব্যক্তিটি বড় বড় কথা বলছে। যার জন্য সে লজ্জিতও হচ্ছে। কিন্তু সেটাকে সে ফেরত নিতে পারছে না।

তারপর তিনি (ﷺ) একটি পাহাড়ী উপত্যকায় এলেন। অতঃপর তিনি ঠাণ্ডা সুগন্ধি এবং মেশকের খোশবু পেলেন। আর একটি আওয়াযও শুনতে পেলেন। তাই তিনি (ﷺ) বললেন, হে জিবরা-ঈল! এটা কী? তিনি বললেন, এটা জান্নাতের ধ্বনি। সে বলছে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আপনি তা দিন, যার ওয়াদা আপনি আমার সাথে করেছেন? এমতাবস্থায় অনেক হয়ে গেছে আমার কামরাগুলো ও রকমারী রেশমী সাজ-সজ্জা এবং আমার লোটা ও বাহনাদি আর আমার মধু ও পানি এবং আমার দুধ ও মদ প্রভৃতি। তাই আপনি আমাকে আমার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিন। তখন আল্লাহ বলেন, তোমার জন্য আছে প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী এবং ঈমানদার নর ও ঈমানদার নারী। তখন জান্নাত বললো, আমি সন্তুষ্ট।

তারপর তিনি (ﷺ) আর একটি উপত্যকায় এলেন। অতঃপর তিনি ভয়ংকর আওয়াজ শুনলেন ও দুর্গন্ধময় গন্ধ পেলেন। তাই তিনি (ﷺ) বললেন, এটা কী? হে জিবরা-ঈল! তিনি বললেন, এটা জাহান্নামের ধ্বনি। সে বলছে, হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে তা দিন যার ওয়াদা আমার সাথে আপনি করেছেন। কারণ, অনেক হয়ে গেছে আমার শিকল ও বেড়ী এবং শাস্তি। আর আমার গভীরতা আরো গভীর হয়েছে এবং আমার তাপটা প্রচণ্ড হয়েছে। তাই আপনি আমাকে দেয়া আপনার ওয়াদাটা পূরণ করুন। তিনি বললেন, তোমার জন্য রয়েছে প্রত্যেক নাপাক নর ও নারী এবং প্রত্যেক দাম্ভিকতাকারী, যে হিসাব-নিকাশের দিনটাকে বিশ্বাস করে না। তখন জাহান্নাম বললো, আমি সন্তুষ্ট। তারপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে এলেন। অতঃপর বুরাকটাকে একটি পাথরে বেঁধে মসজিদে ঢুকলেন।[৯০]

শিক্ষণীয় বিষয় :

১. রাসূল (ﷺ)-কে সবচেয়ে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাত করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
২. বিভিন্ন আসমানে রাসূল (ﷺ) নবীদের সাথে সাক্ষাত ও কুশল বিনিময় করেছেন।
৩. রাসূল (ﷺ) সকল নবীদের ইমাম হয়ে দুরাক'আত সলাত আদায় করেছেন।
৪. এ রাতে উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফর্‌য করা হয়েছে।
৫. জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা সাতশোগুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দিবেন।
৬. সলাতের প্রতি যত্নবান হওয়া নাহলে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।
৭. প্রত্যেক নাপাক নর ও নারী এবং প্রত্যেক দাম্ভিকতাকারী, যে হিসাব-নিকাশের দিনটাকে বিশ্বাস করে না তার জন্য জাহান্নাম।

[৯০] *তাফসীরে দুররে মানসূর- ৩/২৬৯ পৃ.।*

অনুবাদ সাহিত্য :

যুবকদের ইসলামী শিক্ষা ও লালন-পালন

মূল : ড. আব্দুর রহমান বাল্লাহ আলী*
ভাষান্তরে- আব্দুল্লাহীল হাদী**

[তৃতীয় পর্ব]

প্রশংসা ও সম্মান : যুবকরা যখন তাদের দ্বীনের প্রতি আন্তরিক হয়- দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে, তার দিকে দা'ওয়াত দেয় এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে তখন তারা সম্মান ও গৌরবের সব পদকে ভূষিত হওয়ার যোগ্য হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা প্রশংসা করেছেন আসহাবে কাহ্ফ-এর তরুণদের, যারা তাদের ঈমান রক্ষার জন্য নিজ জাতি থেকে পালিয়ে একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং তাদের রবের রহমত প্রত্যাশা করেছিল। তিনি বলেছেন :

﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾

"তারা ছিল কয়েকজন যুবক, যারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল; আর আমরা তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।"[১]

আল্লাহ তা'আলা তাদের এই অবস্থানটিকে কুরআনে অমর করে রেখেছেন, যা চিরকাল তিলাওয়াত করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা আরো উল্লেখ করেছেন ইব্রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর অবস্থান- যিনি তার সম্প্রদায়ের সামনে সাহসের সাথে তাওহীদের কালিমা ঘোষণা করেছিলেন, যখন তারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। তার দৃঢ় আহ্বানের সামনে তাদের অন্তর কেঁপে উঠেছিল এবং তাদের দেব-দেবী ব্যর্থ ও অপমানিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾

"তারা বলল : আমরা এক যুবককে এদের (মূর্তির) কথা বলতে শুনেছি তার নাম ইব্রা-হীম।"[২]

আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) ধর্মপরায়ণ, ন্যায়পরায়ণ, মহান আল্লাহর আনুগত্যে বেড়ে ওঠা যুবকদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদেরকে সেই সাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন নিজের আরশের ছায়ায় রাখবেন। তিনি (ﷺ) বিভিন্ন গুরুতর দায়িত্বও যুবকদের হাতে অর্পণ করেছিলেন।

তিনি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে, যিনি তখন ছিলেন তারুণ্যের শুরুতে, নিজের বিছানায় শোয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, যখন কুরাইশের ৭০ যুবক নবীকে হত্যা করতে প্রস্তুত ছিল। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পরে বলেন :

"আল্লাহর কসম! সেই রাতের মতো আর কোনো রাতে আমি এত প্রশান্তিতে ঘুমাইনি।"

নবী (ﷺ) মুসআব ইবনু 'উমাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে, যিনি তখন ছিলেন খুব তরুণ, মদীনায় দা'ওয়াতের দায়িত্ব দেন। তিনি এত সফল হন যে মদীনার একটি বড় অংশ তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। উহুদের দিনে নবী (ﷺ) যুবকদের মতামতকে প্রবীণদের মতামতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

তিনি আরো 'উসামাহ্ ইবনু যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র হাতে শাম (সিরিয়া) অভিমুখী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন তিনি তখন কেবল কিশোর বয়সে, যেখানে বহু সিনিয়র সাহাবী ছিলেন। এভাবেই নবী (ﷺ) যুবকদেরকে জিহাদের সেনা, দা'ওয়াতের কর্মী এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের যোগ্য মনে করতেন।

সাহাবায়ে কিরাম ও পূর্বসূরিদের অনুসরণ : সাহাবায়ে কিরামও নবীর এই সুন্নাহ অনুসরণ করেছেন।

আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যয়েদ ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে কুরআন সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন চরিত্রবান, সুস্থ 'আক্বিদার অধিকারী এবং যোগ্য যুবক যা তাকে এই বড় দায়িত্বের নেতৃত্ব গ্রহণের মর্যাদা দেয়।

বর্তমান সময়ের জন্য শিক্ষা : অতীতে যেমন ছিল, তেমনি আজও উম্মাহর উচিত যুবকদেরকে দ্বীন ও উত্তম চরিত্রে দৃঢ় হতে উৎসাহিত করা, তাদের পথের বাধা দূর করা, তাদেরকে দায়িত্ব অর্পণ করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেওয়া যাতে তারা স্বাধীনভাবে সৎ কাজে এগিয়ে যেতে পারে।

এতে তারা প্রস্তুত হবে, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, লুকিয়ে থাকা শক্তি প্রকাশ পাবে এবং তারা প্রবীণদের অভিজ্ঞতা থেকেও উপকৃত হতে পারবে।

---

* *সহকারী অধ্যাপক, আরবী ভাষা অনুষদ, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।*
** *সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।*
[১] *সূরা আল-কাহ্ফ : ১৩।*
[২] *সূরা আল-'আম্বিয়া- : ৬০।*

যুবকদের শক্তি এবং প্রবীণদের প্রজ্ঞা এক হলে বুদ্ধিমত্তা, ন্যায়, সৎ কাজ এবং উন্নয়ন প্রস্ফুটিত হবে। নইলে বিষয়টি এমন হবে। যেমন- বিজ্ঞ 'আব্বাসী কবি খুরায়মী বলেছেন :

إن الأمور إذا الأحداث دبرها ...

دون الشيوخ ترى في بعضها خللا.

"যে কাজ যুবকরা পরিচালনা করে... যদি সেখানে প্রবীণদের প্রজ্ঞা না থাকে, তাহলে এর মধ্যে ত্রুটি দেখা যায়।"

যুবক ও অনুকরণ (التقليد) **:** সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, "মানুষ স্বভাবগতভাবে সামাজিক প্রাণী।" অর্থাৎ- মানুষ কোনো সমাজ বা গোষ্ঠীর মধ্যে না থাকলে জীবনের স্বাদ পায় না। আর যখনই একটি গোষ্ঠী থাকে, তখন অবশ্যই কেউ কারো উপর প্রভাব ফেলে এবং একে অন্যকে অনুকরণ করে। কারণ অনুসরণ (তাকলিদ) হলো শিক্ষা গ্রহণ ও অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের অন্যতম মাধ্যম বিশেষত যারা যৌবনের উচ্ছ্বাসে এবং জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে থাকে তাদের জন্য।

বাস্তবতা হলো আধুনিক প্রযুক্তি এবং দ্রুতগতির যোগাযোগব্যবস্থা পুরো পৃথিবীকে এক পরিবারে পরিণত করেছে, যাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

এতে কোনো ক্ষতি নেই; বরং উপকারই আছে।

কিন্তু ক্ষতি তখনই দেখা দেয়, যখন এই ঘনিষ্ঠতা "মিশে যাওয়া"-তে রূপ নেয় এবং এই সংযোগ "গলে যাওয়া"-য় পরিণত হয় যার ফলে মানুষ তার মৌলিকতা, স্বকীয়তা এবং ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে।

আমরা চাই না যে অন্য সংস্কৃতির হাওয়া আমাদের ওপর বয়ে আসবে; কিন্তু আমরা কখনোই রাজি নই যে এই হাওয়া ঝড়ে পরিণত হয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক বৃক্ষকে উপড়ে ফেলবে।

আজ তুমি দেখবে আমাদের বহু যুবক আমাদের সুন্দর অভ্যাস ও আসল ঐতিহ্য ত্যাগ করে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যদের অনুকরণে ঝুঁকে পড়ছে এবং তারা শুধু অনুকরণেই থেমে থাকেনি; বরং সেই অনুকরণের প্রতি আহ্বান (দা'ওয়াত) দিতেও শুরু করেছে, এই ধারণায় যে, পশ্চিম থেকে যা কিছু আসে তা সবই সত্য ও অগ্রগতির নিদর্শন, আর তা থেকে বিমুখ হওয়া পশ্চাদপদতা ও পশ্চাদ্মুখী।

আর ন্যায়ের খাতিরে স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে, পশ্চিম থেকে যা আসে তা সবই মন্দ নয়; বরং সেখানে অনেক উজ্জ্বল ও কল্যাণকর দিকও রয়েছে। তাই আমাদের উচিত থেমে চিন্তা-ভাবনা করা, যাচাই-বাছাই করা, অন্ধভাবে অনুসরণ না করা। (রাতের কাঠুরের মতো নয়)। যা আমাদের দ্বীন ও নৈতিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আমরা তা গ্রহণ করব হিকমত যেখান থেকেই আসুক গ্রহণযোগ্য। আর যা আমাদের দ্বীনবিরোধী, আমরা তা বীজের মতো ছুঁড়ে ফেলব।

কিন্তু আমাদের যুবসমাজ– আল্লাহ তা'আলা তাদের হিদায়াত দিন। পশ্চিমাদের অনুসরণ করেছে অন্ধকার দিকগুলোতে, আর আলোকিত দিকগুলো ছেড়ে দিয়েছে। তাদের অবস্থা– যেমন- শাইখ মুহাম্মদ গাজালী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, সেই যক্ষ্মাপীড়িত দুর্বল মানুষের মতো, যে বিশালদেহী, শক্তিশালী এক দানবকে দেখল, যে ধূমপান করছিল। কিন্তু সে তার শক্তি-সামর্থ্য দেখে মুগ্ধ হলো না; বরং মুগ্ধ হলো তার ধূমপানে; ফলে সেটাই অনুকরণ করল এবং নিজের উপর নেমে আনল দুর্বলতা ও ধ্বংস।

সম্ভবত ইসলামি শিক্ষা-ব্যবস্থাই পারে আমাদের যুবসমাজকে পশ্চিমা সভ্যতার ক্ষতিকর দিকগুলো চিনিয়ে দিতে, যাতে তারা তার চমকপ্রদ বাহ্যিক চাকচিক্যে প্রতারিত না হয় এবং তার ফাঁপা রঙিন খোলসে বিভ্রান্ত না হয়। পাশাপাশি ইসলামি শিক্ষা তাদের উদ্বুদ্ধ করবে আমাদের মহান ইসলামি নৈতিকতা ও ঐতিহ্যবাহী জাতীয় মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরতে, যাতে আমাদের ঐতিহ্য সংরক্ষিত থাকে এবং আমরা তা নিয়ে গর্ব করতে পারি। তাদের এই দৃঢ়তা অন্যের ওপর নির্ভরতা থেকে মুক্ত করবে, অপকার থেকে রক্ষা করবে এবং মানসিক-নৈতিক বিচ্যুতি থেকে প্রতিরোধ করবে।

ইসলামি শিক্ষা আরো তাদের জানাবে ইসলামী সভ্যতা ইউরোপের উন্নতিতে যে বিশাল ভূমিকা রেখেছে তা; এবং আজকের পশ্চিমা জাগরণ প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রভাবেই ত্বরান্বিত হয়েছে। মুসলমানদের প্রচেষ্টা না থাকলে ইউরোপের রেনেসাঁ কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যেত। ইবনে সিনা ও অন্যান্য মুসলিম বিজ্ঞানীদের গ্রন্থে লা ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পড়ানো হতো। মুসলিম পণ্ডিতগণ জ্ঞানচর্চার সকল শাখায় ইউরোপের শিক্ষক ছিলেন। পশ্চিমা জাতিগুলো জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের কাছে ঋণী এবং ইউরোপের আলেম ও গবেষকরাও এ সত্য স্বীকার করেছেন (সত্য তো সেটাই, যা শত্রুরাও স্বীকার করে)।

আসলে তাদের এই স্বীকৃতির আমরা ততটা মোহগ্রস্ত নই; কিন্তু আমরা এগুলো উল্লেখ করি এই কারণে যে আমাদের মানুষগুলো আজ সেই জিনিস অস্বীকার করে যা অন্যরা জেনে নিয়েছে এবং অবহেলা করে যা অন্যান্য জাতি স্বীকার করেছে। যেন তারা তা উপলব্ধি করে, গুরুত্ব দেয় এবং তার দুর্গ-প্রাচীর উঁচু করতে সচেষ্ট হয় যাতে শত্রু ও হিংসুকরা ক্ষুব্ধ হয়। *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

মহিলা জগত :

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জান্নাতী নারীর গুণাবলী

ছালেহা বেগম*

ইসলাম নারীর মর্যাদা ও দায়িত্বকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। ইসলামী শিক্ষায় নারীর আত্মিক উন্নতি, নৈতিক চরিত্র, সামাজিক দায়িত্ব ও 'ইবাদতকে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে দেখা যায়, নারীর জান্নাতে প্রবেশের জন্য মূল ভিত্তি হলো ঈমান, সৎকর্ম, ধৈর্য্য, এবং মহান আল্লাহর প্রতি ভক্তি। তবে এগুলো শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয়; বরং নারীর সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্বকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

১. ঈমান এবং আল্লাহভীতি : ইসলামে নারীর জান্নাতপ্রবেশের প্রধান শর্ত হলো ঈমান ও আল্লাহর প্রতি ভয়। কুরআন স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে– "যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য সত্যই জান্নাত রয়েছে।"[৯৩]

হাদীসেও বলা হয়েছে, নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) বলেছেন : "নারী ও পুরুষ উভয়ই যদি সত্যিকারের ঈমান ও সৎকর্মে আগ্রহী হয়, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৯৪]

যুক্তি অনুযায়ী, ঈমান কেবল বিশ্বাস নয়; এটি ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি কাজ ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। একজন নারী যখন আল্লাহভীতির সঙ্গে প্রতিদিনের কাজ সম্পন্ন করে, তখন তার প্রতিটি ছোট কাজও 'ইবাদতের মর্যাদা পায়।

২. 'ইবাদত ও আত্মশুদ্ধি : নিয়মিত নামায, রোযা, যাকাত ও অন্যান্য 'ইবাদত নারীর জন্য জান্নাতের প্রবেশপথ খোলে। কুরআন ও হাদীস নির্দেশ করে, ঘরে 'ইবাদতও সমান গুরুত্বপূর্ণ। হাদীসে এসেছে–

"যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রোযা ও অন্যান্য 'ইবাদত সঠিকভাবে পালন করে, সে জান্নাতের অধিকারী।"[৯৫]

যুক্তি অনুযায়ী, 'ইবাদত নারীর আধ্যাত্মিক শক্তি ও মনোবল বাড়ায়। এটি তাকে সামাজিক দায়িত্ব ও নৈতিক মূল্যবোধ বজায় রাখতে সহায়তা করে।

৩. নৈতিক চরিত্র ও সদাচরণ : সৎ চরিত্র, ধৈর্য্য, নম্রতা, ক্ষমাশীলতা ও সত্যবাদিতা নারীর জন্য জান্নাতের মূল ভিত্তি। কুরআন ও হাদীসে এই গুণাবলী মহান আল্লাহর প্রিয় হিসেবে উল্লেখ রয়েছে।

নবী (ﷺ) বলেছেন : "শালীন এবং ধৈর্যশীল নারী মহান আল্লাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।"[৯৬]

যুক্তি অনুযায়ী, নৈতিক চরিত্র সামাজিক সম্পর্ক মজবুত করে, পরিবারের শান্তি বজায় রাখে এবং ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।

৪. পরিবার ও সামাজিক দায়িত্ব : নারীর পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে যত্নবান হওয়া জান্নাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনে বলা হয়েছে– "আপনারা নিজেদের সন্তান এবং পরিবারকে সৎভাবে পালন করুন। এটি আল্লাহর কাছে প্রিয়।"[৯৭]

যুক্তি অনুযায়ী, পরিবার ও সমাজের কল্যাণে অবদান রাখার মাধ্যমে নারী শুধুমাত্র সামাজিক দায়িত্ব পূর্ণ করেন না; বরং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন করেন।

৫. সহানুভূতি, দান ও সাদাক্বাহ্ : নারী যদি দরিদ্র ও অসহায়দের সহায়তা করে, আল্লাহ তা গ্রহণ করেন। হাদীসে এসেছে– "একজন নারী যদি গরিব ও অসহায়কে সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে জান্নাত প্রদান করবেন।"[৯৮]

যুক্তি অনুযায়ী, সাহায্য ও সাদাক্বাহ্ শুধুমাত্র অর্থগত নয়; এটি মানবিক সহানুভূতি ও সমাজের নৈতিক উন্নয়নের প্রতিফলন।

৬. ধৈর্য্য ও জীবনের পরীক্ষা : জীবনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও কষ্ট ধৈর্য সহকারে গ্রহণ করাও নারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন : "নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের জন্য পুরস্কার রয়েছে।"[৯৯]

যুক্তি অনুযায়ী, ধৈর্য্য নারীর মানসিক দৃঢ়তা বাড়ায় এবং তাকে স্ব-সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম করে।

উপসংহার : নারী হোক বা পুরুষ, জান্নাতের মূল চাবিকাঠি হলো ঈমান, সৎকর্ম, ধৈর্য্য, নৈতিক চরিত্র এবং আল্লাহর প্রতি ভক্তি। কুরআন ও সহীহ হাদীস স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছে যে, নারী যদি এই গুণাবলী অর্জন করে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, নারীর 'ইবাদত, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ব পালন একত্রে তাকে আধ্যাত্মিক ও সামাজিকভাবে শক্তিশালী করে, যা স্বর্গীয় শান্তি এবং আখিরাতের সাফল্য নিশ্চিত করে।

---

* *ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুচরা বাজার ডট কম।*

[৯৩] *সূরা আল-বাকারাহ্ : ২২৫।*
[৯৪] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[৯৫] *সহীহ মুসলিম।*
[৯৬] *সহীহ আত্ তিরমিযী।*
[৯৭] *সূরা আন্-নিসা : ৩৫।*
[৯৮] *সহীহুল বুখারী।*
[৯৯] *সূরা আস্-সাজদাহ্ : ১১।*

বিস্ময়কর মি'রাজ :

আসমানি সফর : সুন্নাহর অনুসরণ ও বিদ'আত পরিহার

আরাফাত ডেস্ক

মি'রাজ বিশ্বনবী (ﷺ)-এর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এটি এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল যখন মুসলমানদের উপর চলছিল চরম নির্যাতন। সে সময় এ ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তার এ দীনকে আরো সফলতার দিকে নিয়ে গিছেন। এ মি'রাজ রজনীতেই মানব জাতির শ্রেষ্ঠ 'ইবাদত পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফর্‌য হয়।

ইস্‌রা ও মি'রাজ শব্দদ্বয়ের পরিচয় : ইসরা ও মি'রাজ إِسْرَاءٌ وَمِعْرَاجٌ-এ দু'টো শব্দ সকল মুসলিমের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত। দু'টোই আরবি শব্দ। إِسْرَاءٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ নৈশ ভ্রমণ। আর مِعْرَاجٌ শব্দের অর্থ সিঁড়ি বা আরোহণ করার মাধ্যম। عُرُوْجٌ শব্দের অর্থ সিঁড়িতে আরোহণ করা বা ঊর্ধ্বে গমন করা।

মি'রাজ এর সঠিক সন ও তারিখ : 'মি'রাজ' সংঘটিত হয়েছিল রজব মাসে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মি'রাজ যখন হয়েছিল তখন সাল ও তারিখ লেখার চর্চা ছিল না বলে মি'রাজ সংঘটনের সঠিক সাল ও তারিখ নিয়ে বহু মতভেদ হয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, এ ব্যাপারে ১০টিরও বেশি অভিমত আছে।[১০০]

তা হলো এই–

১. হিজরতের ছয় মাস আগে।

২. ইমাম ইবনুল জাওযীর মতে নবুওয়াতের ১২ সনের ২৭ রজবের রাতে।[১০১]

৩. ইবনু সা'দের বর্ণনায় আছে, হিজরতের এক বছর আগে ১৭ই রবিউল আউয়ালে।

৪. তাঁর অন্য বর্ণনায় মি'রাজ সংঘটিত হয় হিজরতে মদীনার আঠারো মাস আগে সতের (১৭) রমাযান শনিবার রাতে।[১০২]

৫. আল্লামা ইবনু 'আবদুল বার প্রমুখ বলেন, মি'রাজ ও হিজরতের মাঝে চৌদ্দ মাসের ব্যবধান ছিল।[১০৩]

৬. ইব্‌রা-হীম হারবীর মতে, হিজরতের এগার মাস আগে।

৭. ইবনু ফা-রিস বলেন, পনের মাস আগে।

৮. আল্লামা সুদ্দী বলেন, সতের মাস আগে।

৯. ইবনু কুতাইবার বর্ণনায় আঠার মাস আগে।

১০. ইবনুল আসীরের মতে, হিজরতের তিন বছর আগে।

১১. কাযী ইয়ায ও কুরতুবী এবং ইমাম নবভী প্রমুক যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, হিজরতের পাঁচ বছর আগে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল।[১০৪]

আল্লামা কাযী সুলাইমান মনসূরপুরীর মতে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল নবুওয়াতের দশম সনে সাতাশে রজবের রাতে।[১০৫]

ইংরেজি তারিখ ছিল ৬২০ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মার্চ তথা হিজরতের দু'বছর আগে ২৭শে রজবের রাতে।[১০৬]

বর্তমানে সবারই মতে ঐ রাতটা ছিল ২৭ রজবের রাত এবং সালটা ছিল নবুওয়াতের ১০ম সন।

মি'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা : রাসূল (ﷺ) মক্কায় মসজিদে হারাম হতে বুরাকে চড়ার পর জিবরীলের সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হন। হঠাৎ রাস্তার এক দিকে তিনি একটি বুড়ীকে দেখতে পান। তিনি (ﷺ) বলেন, এটা কে? হে জিবরা-ঈল। তিনি বলেন, চলুন, হে মুহাম্মাদ! তিনি চলতে থাকেন। আবার রাস্তার ধারে একটি জিনিস তাঁকে ডাকলো, আসুন, হে মুহাম্মাদ! তখন জিবরা-ঈল তাঁকে বলেন, চলুন, হে মুহাম্মাদ! তাই তিনি চলতে লাগলেন। অতঃপর মহান আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কিছু সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তাঁরা বললেন, আসসালামু আলাইকা, হে হাশির (যাঁর পরে কেউ নেই)। তখন তাঁকে জিবরা-ঈল (আলাইহিস সালাম) বলেন, আপনি সালামের জওয়াব দিন। তাই তিনি সালামের জওয়াব দিলেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়জনের সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁদেরকেও তিনি ঐরূপ বললেন।

---

[১০০] *ফাতহুল বারী- ৭/২০৩ পৃ.।*
[১০১] *সীরাতে সাইয়্যিদুল আম্বিয়া- ২৬৮ পৃ.।*
[১০২] *ত্বাক্বা-তু ইবনু সা'দ- ১/১৬৬ পৃ.।*
[১০৩] *যা-দুল মা'আ-দ- ৩/৩৭ পৃ.।*
[১০৪] *ফাতহুল বারী- ৭/২০৩ পৃ.।*
[১০৫] *রহ্‌মাতুল্লিল 'আলামীন- ৭০ পৃ.।*
[১০৬] *পয়গম্বরে আযম ওয়া আ-খির- ৩৪৫ পৃ.।*

পরিশেষে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে গেলেন। অতঃপর তাঁর কাছে পানি ও মদ এবং দুধ পেশ করা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুধটাকে গ্রহণ করলেন। অতঃপর জিবরা-ঈল (আলাইহিস সালাম) বলেন, আপনি স্বভাবজাত প্রকৃতিকে পেয়ে গেছেন। আপনি যদি পানিটা পান করতেন তাহলে আপনি ডুবে যেতেন এবং আপনার উম্মাতও ডুবে যেত। আর আপনি যদি মদটা পান করতেন তাহলে আপনি পথভ্রষ্ট হতেন এবং আপনার উম্মাতও বিভ্রান্ত হয়ে যেত।... তারপর জিবরা-ঈল বলেন, সেই বুড়ীটা যাকে আপনি রাস্তার ধারে দেখেছিলেন সে হচ্ছে পৃথিবীর সেই অংশ যতটা বয়স এই বুড়ীটার বাকী আছে। আর সে চেয়েছিল যে, আপনি তার প্রতি আকৃষ্ট হন। সে ছিল মহান আল্লাহর দুশমন ইবলিস। সে চেয়েছিল যে, আপনি তার দিকে ঝুঁকে যান। আর যাঁরা আপনাকে সালাম দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন ইব্‌রা-হীম এবং মূসা ও 'ঈসা।[১০৭]

এছাড়াও বায়তুল মুকাদ্দাসের পথে আরো অনেক শিক্ষণীয় ঘটনা অবলোকন করেন। তিনি (ﷺ) বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন এবং সকল নবীদের ইমাম হয়ে তিনি দু'রাক'আত নামায আদায় করেন। তারপর তিনি (ﷺ) জিবরাঈলের সাথে প্রথম আসমান হয়ে সপ্তম আসমানে গিয়ে মহান আল্লাহর দিদার লাভে ধন্য হন। রাসূল (ﷺ)-এর সাথে প্রথম আসমান থেকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত অনেক নবীদের সাক্ষাত ও কথাবার্তা হয়েছিল।

নবীদের সাথে সাক্ষাতের রহস্য : মি'রাজের রাতে কতিপয় বিশিষ্ট নবীর সাথে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাক্ষাত হয়েছিল। ঐ সাক্ষাতের রহস্য সম্পর্কে রহস্যসন্ধানী কোনো কোনো 'আলেম কিছু তথ্য পেশ করেছেন। তা হলো এই–

১. মি'রাজের রাতে ১ম আকাশে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে আদম (আলাইহিস সালাম)-এর সাক্ষাত হয়। অন্যদের মতে, আদম (আলাইহিস সালাম)-কে যেহেতু জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেহেতু তাঁর সাথে প্রথমেই রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষাত হওয়াতে এ কথার সতর্কবাণী রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কেও তাঁর মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে মদীনার দিকে হিজরত করতে হবে। তাঁদের দু'জনের মধ্যে সামঞ্জস্য এই যে, দু'জনকেই প্রিয়ভূমি ত্যাগ করার কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। তারপর দু'জনেরই পরিণতি সেই প্রিয়ভূমিতেই প্রত্যাবর্তন হয়েছে। যেখান থেকে তাঁদের দু'জনকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।[১০৮]

২. ২য় আকাশে 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষাত হয়। তা এই জন্য যে, তিনিই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সবচেয়ে কাছাকাছি সময়ের নবী।[১০৯]

অন্য বিদ্বানের মতে, 'ঈসারও হিজরতটা হয়েছিল দুশমনির কারণে এবং তাঁকেও মেরে ফেলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।[১১০]

৩. ৩য় আকাশে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর ভাইয়েরা যেমন তাঁকে হত্যার চেষ্টা করছিল। তেমনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তাঁর কুরাইশ ভাইয়েরা হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। এমতাবস্থায় শেষ পরিণতি ইউসুফেরই হাতে থাকে। তেমনি ঐরূপ পরিণতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এরও হয়েছিল। যেমন- তিনি মক্কা বিজয়ের দিনে কুরাইশদেরকে সেই কথাটিই বলেছিলেন যে কথাটি ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) তাঁর ভাইদের বলেছিলেন : লা-তাস্‌রীবা আলাইকুমূল ইয়াওম্‌..... আজকের দিনে তোমাদের প্রতি কোন রকমই অভিযোগ নেই।[১১১]

৪. ৪র্থ আকাশে ইদরিস (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষাত হয়। ইদরিস (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন– অরাফা'না-হু মাকা-নান আলিয়্যা– আমি তাঁকে উচ্চমর্যাদা দান করছি। তেমনি মি'রাজের মাধ্যমে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে উচ্চমর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

৫. ৫ম আকাশে হারুনের সাথে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাক্ষাত হয়েছিল। তার রহস্য হিসাবে ভাবা হয় যে, হারুনকে তাঁর জাতি কষ্ট দেয়ার পরে যেমন তাঁকে তারা ভাল বেসেছিল। তেমিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কৃওমও তাঁকে অমানুষিক নির্যাতন করার পর তাঁর প্রতি অঢেল প্রেম ঢেলে দিয়েছিল।

৬. ৬ষ্ঠ আকাশে মূসা নবীর সাথে তাঁর (ﷺ) সাক্ষাত হয়েছিল। তার রহস্য এই যে, মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে তাঁর কৃওম খুবই কষ্ট দিয়েছিল।[১১২]

---

[১০৭] *তাফসীরে ত্বাবারী- ১৫/৫ পৃ.।*

[১০৮] *ফাতহুল বারী- ৭/২১০ পৃ.*

[১০৯] *ফাতহুল বারী- ৭/২১১ পৃ.।*

[১১০] *আল ইস্‌রা- ৭২ পৃ.।*

[১১১] *আল ইস্‌রা- ৭২ পৃ.।*

[১১২] *ফাতহুল বারী- ৭/২১১ পৃ.।*

মি'রাজের রাতে উপহার : আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনায় আছে, যখন আমি পালনকর্তা এবং মূসার মাঝে ফেরাফেরী করছিলাম তখন একবার আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মুহাম্মাদ! এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায দিন ও রাতে থাকল। প্রত্যেক নামাযের জন্য দশ নেকী তাই ওটা পঞ্চাশ নামায হলো। যে ব্যক্তি ভাল কাজের সংকল্প করবে। অতঃপর সে ঐ কাজটা করল না তার জন্য একটি নেকী লেখা হবে। কিন্তু সে যদি ওটা করে তাহলে তার জন্য দশটা নেকী লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি একটি মন্দ কাজের সংকল্প করবে। অথচ ওটাকে সে করল না তার জন্য কোন জিনিসই লেখা হবে না। কিন্তু সে যদি ওটাকে করে ফেলে তাহলে তার জন্য একটি মন্দ লেখা হবে।[১১৩]

বিশিষ্ট সাহাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ বলেন, মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তিনটি জিনিস দেয়া হয়েছিল : ১) পাঁচওয়াক্ত নামায ২) সূরা আল বাকারার শেষাংশ ৩) তাঁর উম্মাতের যে ব্যক্তি কোন জিনিষকেই মহান আল্লাহর সাথে শরীক করে না তার ধ্বংসাত্মক পাপগুলোকে ক্ষমা করা।[১১৪]

মি'রাজ উপলক্ষে করণীয় ও বর্জনীয় : মি'রাজ উপলক্ষে আমাদের সমাজে বিভিন্ন সভা-সেমিনার এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের 'ইবাদত করা হয়। যেমন- নামায, রোযা ইত্যাদি। আসলে এগুলোর কুরআন ও সুন্নায় ভিত্তি আছে কিনা এ সম্পর্কে কোন খেয়াল করা হয় না।

মি'রাজ ও নফল নামায : অনেক মুসলিম ভাই ও বোনরা মি'রাজ উপলক্ষে কেউ ১২ রাক'আত, কেউ ২০ রাকাত নামায আদায় করে থাকেন। ইসলামী শরী'আতে মি'রাজের নামায বলে কিছু নেই। নফল নামায পড়া সওয়াবের কাজ কিন্তু মি'রাজ উপলক্ষে নফল নামায আদায় করার কোনো ভিত্তি ও প্রমাণ ইসলামে নেই। কাজেই মি'রাজের নামে নফল নামায আদায় করা এবং এর ব্যবস্থা প্রণয়ন করা মানে ইসলামী শরী'আতে নিজের পক্ষ থেকে কিছু সংযোজন করা। আর এ ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে আমাদের ধর্মে এমন কিছু সংযুক্ত বা উদ্ভাবন করবে, যা তার (শরী'আতের) অংশ নয়- তা প্রত্যাখ্যাত হবে।[১১৫]

মি'রাজ উপলক্ষে রজব মাসের ফযীলাত সম্পর্কেও বহু জাল হাদীস শুনা যায়। তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নে উদ্ধৃত হলো– ১. আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রজবের প্রথম রজনীতে মাগরিবের সলাতের পর বিশ রাক'আত সলাত আদায় করবে, যার প্রত্যেক রাক'আতে সূরা আল ফাতিহাহ্ ও সূরা আল ইখলা-স পড়বে...'। অতঃপর দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীসটি মওযূ' বা জাল।[১১৬]

আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রজবের রজনীতে চৌদ্দ রাক'আত সলাত আদায় করবে, যার প্রত্যেক রাক'আতে সূরা আল ফাতিহাহ্ একবার, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ বিশবার, কুল আঊযু বিরব্বিল ফালাক্ব তিনবার, কুল আঊযু বিরব্বিন নাস তিনবার পড়বে। অতঃপর সলাত হতে ফারেগ হয়ে দশবার দরূদ পড়বে...' ইত্যাদি। ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীসটি মওযূ'।[১১৭]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রজবের দিবসে সিয়াম পালন করবে এবং চার রাক'আত সলাত আদায় করবে, যার প্রথম রাক'আতে একশতবার আয়াতুল কুরসী পড়বে...' ইত্যাদি ইত্যাদি। ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীসটি মওযূ'। এর সনদে 'উসমান নামক রাবী মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে পরিত্যক্ত।[১১৮]

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ২৭ রজব (অর্থাৎ- মি'রাজের রাত্রিতে) 'ইবাদত করবে, তার 'আমলনামায় একশ' বছরের 'ইবাদতের সওয়াব লেখা হবে'। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রজব মাসের ২৭ তারিখের রাতের সলাতের ব্যাপারে উলামায়ে ইসলাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এটি প্রমাণযোগ্য নয় একটি অতি প্রচলিত ভিত্তিহীন হাদীসের দৃষ্টান্ত,

اَلصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ- "নামায হলো মু'মিনদের মি'রাজ।"[১১৯]

আল্লামা ইবনু রজব, ইবনু হাজার আসকালানী, আস সুয়ূতী, মোল্লা 'আলী ক্বারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এক বাক্যে বলেছেন : রজব মাসে বিশেষ কোনো সলাত বা রজব মাসের কোনো দিনে বা রাতে কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে

[১১৩] *সহীহ মুসলিম- ১/৩০৪ পৃ.।*
[১১৪] *সহীহ মুসলিম- ১/ ৯৬ পৃ., মিশকাত- ৫২৯ পৃ.।*
[১১৫] *সহীহুল বুখারী- ১/৩৭১।*
[১১৬] *কিতাবুল মওযূয়াত- ২/১২৩।*
[১১৭] *কিতাবুল মওযূয়াত- ২/১২৩।*
[১১৮] *কিতাবুল মওযূ'আত- ২/১২৩।*
[১১৯] *বার চান্দের ফযীলাত- মুফতী হাবীব সামদানী, পৃ. ১২৩।*

বিশেষ সলাত আদায় করলে বিশেষ সাওয়াব পাওয়া যাবে, এ মর্মে একটি হাদীসও গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বাতিল। কেননা, এ সবই বানোয়াট।[১২০]

মি'রাজ ও নফল রোযা : আমাদের অনেক মুসলিম ভাই ও বোনেরা- লাইলাতুল কদরের সাথে মিলিয়ে মি'রাজেও নফল রোযা রেখে থাকেন। একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য- নফল রোযা যখন ইচ্ছা তখন রাখা যায় কিন্তু কোনো উপলক্ষে নফল রোযা রাখতে হলে অবশ্যই আগে জেনে নিতে হবে যে আমি বা আমরা যে উপলক্ষে নফল রোযা রাখছি শরী'আত সেটাকে অনুমতি দিয়েছে কি-না। মি'রাজ উপলক্ষে নফল রোযা রাখার কোনো বর্ণনা কুরআন-হাদীসের কোথাও বর্ণিত নেই। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ও তার অনুসারীরা এই দিনে বিশেষভাবে কোনো রোযা রেখেছেন এমন কোনো বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এই দিনে মি'রাজ উপলক্ষে রোযা রাখা কোনো 'ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না। মি'রাজের নফল রোযা সম্পর্কে অসংখ্য জাল হাদীস এসেছে। যেমন- আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি রজব মাসের ২৭ তারিখ অর্থাৎ- মি'রাজ দিবসে সিয়াম পালন করবে, তার 'আমলনামায় ৬০ মাসের সিয়ামের নেকী লেখা হবে'।

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নামে বর্ণিত জাল হাদীসে আছে যে, রাসূল (ﷺ) নাকি বলেছেন, 'রজব মাস মহান আল্লাহর মাস, শা'বান মাস আমার মাস এবং রামাযান মাস উম্মাতের মাস। অতএব যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় নেকীর আশায় রজবের সিয়াম পালন করবে তার জন্য মহান আল্লাহর মহা সন্তোষ অবধারিত হয়ে যায় এবং তাকে তিনি জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দিবেন...। যে ব্যক্তি রজব মাসে ২ থেকে ১৫টি সিয়াম পালন করবে, তার নেকী পাহাড়ের মত হবে... সে কুষ্ঠ, শ্বেত ও পাগলামী রোগ থেকে মুক্তি পাবে।... জাহান্নামের সাতটি দরজা তার জন্য বন্ধ থাকবে।... জান্নাতের আটটি দরজা। তার জন্য খোলা থাকবে'। জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসটি জাল।[১২১]

"রজব মাসের ২৭ তারিখ আমি নবুওয়াত পেয়েছি। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দিনে রোযা রাখবে, তা তার ৬০ মাসের গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে।"[১২২]

আরো একটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে, ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ২৭শে রজবের সকাল থেকে ইতিকাফ আরম্ভ করতেন। যোহর পর্যন্ত নামাযে মাশগুল থাকতেন, যোহরের পর অমুক অমুক সূরা দিয়ে চার রাক'আত বিশেষ সলাত আদায় করতেন এবং 'আসর পর্যন্ত দু'আতে থাকতেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরূপ করতেন।[১২৩]

ইবনু হাজার আল আসকালানী, মোল্লা 'আলী ক্বারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল আজলুনী, 'আবদুল হাই লাখনবী, দরবেশ হুত প্রমুখ মুহাদ্দিস বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ২৭ রজবের ফযীলাত, এ তারিখের রাতের 'ইবাদত, দিনে সিয়াম পালন বিষয়ে বর্ণিত সকল কথাই বানোয়াট জাল ও ভিত্তিহীন।[১২৪]

মি'রাজের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মি'রাজ তথা ঊর্ধ্বলোকে গমনের উদ্দেশ্য ব্যাপক। মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নবুওয়াতী জীবনে মি'রাজের মত এক মহিমান্বিত ও অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পেছনে যে কারণগুলো মুখ্য তা হলো– (১) আল্লাহর একান্ত সান্নিধ্যে হাযির হওয়া, (২) ঊর্ধ্বলোক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন, (৩) অদৃশ্য ভাগ্য সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ, (৪) ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, (৫) স্বচক্ষে জান্নাত-জাহান্নাম অবলোকন, (৬) পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের সাথে সাক্ষাৎ ও পরিচিত হওয়া, (৭) সুবিশাল নভোমণ্ডল পরিভ্রমণ করা এবং (৮) সর্বোপরি এটিকে একটি অনন্য মু'জিযা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। মি'রাজের শিক্ষা সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে 'আবদ' বা দাস বলে সম্বোধন করেছেন। এর মর্মার্থ এই যে, বান্দার জন্য এর চেয়ে সম্মানিত কোন নাম আল্লাহর কাছে নেই, থাকলে অবশ্যই সে নামে রাসূল (ﷺ)-কে সম্বোধন করে সম্মানিত করা হত। আর মি'রাজের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো সর্বপ্রকার গর্ব-অহংকার চূর্ণ করে আল্লাহর সবচেয়ে বড় দাস হওয়ার চেষ্টা করা। কারণ দাসত্বের মধ্যেই সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদা নিহিত রয়েছে। অতএব জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব করা ও সলাতের হিফাযত করাই হলো মি'রাজের সবচেয়ে বড় এবং মূল শিক্ষা।

---

[১২০] *আল মাসনূ- পৃ. ২০৮।*
[১২১] *কিতাবুল মওযূ'আত।*
[১২২] *তাবয়ীনুল 'আযাব- পৃ. ৬৪, তানযীহ- পৃ. ২/১৬১।*
[১২৩] *আল আসার- 'আবদুল হাই লখনবী, পৃ. ৭৮।*
[১২৪] *আল আসার- পৃ. ৭৭-৭৯।*

তথ্য-প্রযুক্তি

প্রযুক্তির নবযুগ : ২০২৫ সালের যুগান্তকারী উদ্ভাবনসমূহ

ভূমিকা : প্রযুক্তি যুগে যুগে মানবসভ্যতার গতিপথ বদলে দিয়েছে। কৃষি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের পর আমরা এখন প্রবেশ করেছি চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের গভীর পর্যায়ে। ২০২৫ সাল সেই যাত্রাপথে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর, যখন প্রযুক্তি কেবল মানুষের সহায়ক নয়; বরং সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ও অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই বছরে উদ্ভাবিত ও পরিণত প্রযুক্তিগুলো শিক্ষা, চিকিৎসা, অর্থনীতি, পরিবেশ ও দৈনন্দিন জীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে।

১. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) : মানুষের বুদ্ধির সহযাত্রী– ২০২৫ সালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এক নতুন স্তরে পৌঁছেছে, যা পরিচিত Agentic AI নামে। এই AI কেবল নির্দেশ পালন করে না; বরং লক্ষ্য নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

⇨ চিকিৎসাক্ষেত্রে AI রোগীর রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা পরিকল্পনা প্রস্তাব করছে। ⇨ শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক শেখার পরিবেশ তৈরি হচ্ছে, যেখানে শিক্ষার্থীর সক্ষমতা অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা সাজানো হচ্ছে। ⇨ ব্যবসা ও শিল্পে AI ঝুঁকি বিশ্লেষণ, বাজার পূর্বাভাস ও গ্রাহক ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তবে AI-এর বিস্তার কর্মসংস্থান, গোপনীয়তা ও নৈতিকতা নিয়ে নতুন প্রশ্নও তৈরি করেছে, যা ২০২৫ সালে বিশ্বব্যাপী আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

২. কোয়ান্টাম কম্পিউটিং : গণনার সীমা ভাঙার প্রযুক্তি– কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ২০২৫ সালে পরীক্ষামূলক পর্যায় ছাড়িয়ে বাস্তব প্রয়োগের দিকে এগিয়েছে।

⇨ জটিল অণু বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন ওষুধ আবিষ্কার দ্রুততর হচ্ছে। ⇨ জলবায়ু পরিবর্তন মডেলিং ও আবহাওয়ার দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাস আরো নির্ভুল হচ্ছে। ⇨ আর্থিক খাতে বড় অঙ্কের ডেটা বিশ্লেষণ করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সহজ হচ্ছে।

এই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেও নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করছে, কারণ প্রচলিত এনক্রিপশন কোয়ান্টাম কম্পিউটারের সামনে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

৩. অতিদ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা : ৫-এ থেকে ৬এ-এর পথে– ২০২৫ সালে ৫-এ প্রযুক্তি বিশ্বজুড়ে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ৬-এ প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু হয়েছে।

⇨ স্মার্ট শহরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ইন্টারনেটনির্ভর হয়ে উঠছে। ⇨ দূরবর্তী চিকিৎসা (Remote Surgery) ও ভার্চুয়াল অফিস বাস্তবতার অংশ হয়ে উঠেছে। ⇨ গ্রামীণ ও শহুরে ডিজিটাল বৈষম্য কমানোর সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে।

৪. শক্তি ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি : টেকসই পৃথিবীর প্রয়াস– জ্বালানি সংকট ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০২৫ সালে শক্তি প্রযুক্তিতে বৈপ্লবিক উন্নয়ন দেখা গেছে।

⇨ উন্নত ব্যাটারি প্রযুক্তি ইলেকট্রিক যানবাহনকে আরো কার্যকর ও সাশ্রয়ী করেছে। ⇨ সৌর ও বায়ুশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ছে। ⇨ স্মার্ট গ্রিড প্রযুক্তি বিদ্যুৎ অপচয় কমিয়ে টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

৫. ভার্চুয়াল, অগমেন্টেড ও মিক্সড রিয়েলিটি : বাস্তবতার সম্প্রসারণ– ২০২৫ সালে VR, AR ও MR প্রযুক্তি মানুষের অভিজ্ঞতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

⇨ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বাস্তব অনুশীলনের সুযোগ তৈরি হচ্ছে ঝুঁকি ছাড়াই। ⇨ চিকিৎসায় জটিল অপারেশনের আগে ভার্চুয়াল সিমুলেশন চিকিৎসকদের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ⇨ কর্মক্ষেত্রে ভার্চুয়াল মিটিং ও ডিজিটাল অফিস সময় ও খরচ সাশ্রয় করছে।

৬. রোবটিক্স ও স্বয়ংচালিত প্রযুক্তি : মানুষের সহযোগী যন্ত্র– রোবট এখন মানুষের বিকল্প নয়; বরং সহকারী হিসেবে কাজ করছে।

⇨ শিল্পকারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ⇨ হাসপাতাল ও বৃদ্ধাশ্রমে রোবটিক সহায়তা মানুষের জীবন সহজ করছে। ⇨ স্বয়ংচালিত যানবাহন দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে সহায়ক হচ্ছে।

৭. বায়োটেকনোলজি ও স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি : দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের পথে– ২০২৫ সালে বায়োটেকনোলজি ও স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি মানুষের আয়ু ও জীবনের মান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

⇨ জিন্ প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছে। ⇨ পরিধানযোগ্য স্মার্ট ডিভাইস নিয়মিত স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণে সহায়ক। ⇨ মহামারি প্রতিরোধ ও দ্রুত রোগ শনাক্তকরণে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে।

উপসংহার : ২০২৫ সাল প্রযুক্তির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। এই বছর প্রমাণ করেছে যে প্রযুক্তি মানবজীবনের প্রতিটি স্তরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে। সঠিক পরিকল্পনা, নৈতিক ব্যবহার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে পারলে এই প্রযুক্তিগুলো শুধু উন্নয়ন নয়; বরং একটি ন্যায়সংগত, টেকসই ও মানবকল্যাণমুখী ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে।

পত্রিকার পাতা থেকে

আমরা শক্তিশালী এবং ন্যায়সঙ্গত সিরিয়া পুনরুদ্ধার করব : সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমদ আল-শারা

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমদ আল-শারা বাশার আল-আসাদ পতনের এক বছর পূর্তিতে বলেন, আমরা উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে একটি শক্তিশালী এবং ন্যায়সঙ্গত সিরিয়া পুনরুদ্ধার করব।

সিরিয়ার সাবেক সৈরাচারী শাসক বাশার আল-আসাদ পতনের এক বছর এবং সিরিয়ার স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিকীতে গত ৮ ডিসেম্বর দামেস্কের ঐতিহাসিক 'উমাইয়াহ্ মসজিদে ফজরের নামায আদায় করেন প্রেসিডেন্ট আহমদ আল-শারা।

নামায আদায় করার পর আল-শারা তাঁর ভাষণে বলেন : হে সিরিয়ানরা, যতক্ষণ আমি তোমাদের মধ্যে মহান আল্লাহর আনুগত্য করি, ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করো। আল্লাহর কসম, কেউ আমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, সে যত বড় বা শক্তিশালীই হোক না কেন এবং আমরা সকলেই এ সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবো ইন্ শা-আল্লাহ।

প্রেসিডেন্ট আল-শারা আরো বলেন : আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ বিজয় দান করার পর আমাদের প্রথম বিদেশ সফর ছিল সৌদি আরবে। সেই দিন আমরা মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জানাতে পবিত্র কাবার ঘর যিয়ারত করা এবং 'উমরাহ্ পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই সময় আমরা পবিত্র কাবা ঘরে প্রবেশ করে এর ভেতরে নামায আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। ফিরে আসার পর, যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমান আমাদেরকে কাবা ঘরের পর্দার একটি অংশ উপহার প্রদান করেন।

আল-শারা বিজয়ী হয়ে দামেস্কে প্রবেশের সময় যোদ্ধাদের ত্যাগ ও বীরত্বের প্রশংসা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই বিজয় রক্ষা করা এবং এর উপর ভিত্তি করে দেশকে গড়ে তোলা আজকের সমস্ত সিরিয়ানদের উপর কর্তব্য।

প্রেসিডেন্ট আল-শারা বলেন : মহান আল্লাহর ইচ্ছায়, উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে, আমরা একটি শক্তিশালী সিরিয়া পুনর্গঠন করব যার কাঠামো বর্তমান এবং অতীতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, সিরিয়ার প্রাচীন সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। আমরা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর আনুগত্য, নিপীড়িতদের সমর্থন এবং জনগণের মধ্যে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে এটি পুনর্গঠন করব।

আল-শারা তার বক্তৃতা শেষ করেন এই বলে যে, আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি এই দেশকে রক্ষা করেন এবং আমাদেরকে দেশ ও দেশের জনগণের সেবা ও পুনর্গঠনে সাহায্য করেন। *[সূত্র : sana.sy, Syrian Arab News Agency। সিরিয়ার আরবী পত্রিকা সানা অবলম্বনে। অনুবাদে– আব্দুল মতিন।]*

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

স্ট্যান্ডার্ড হিফয বিভাগ

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শেফা আইডিয়াল ইন্সটিটিউট এন্ড অরফানেজে স্ট্যান্ডার্ড হিফয বিভাগে ভর্তি চলছে।

১. **হিফয প্রোগ্রাম :** হিজাযী পদ্ধতিতে পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন হিফযের সুযোগ।
২. **আবাসিক ও অনাবাসিক সুবিধা :** উন্নত আবাসিক ব্যবস্থা। ডে-কেয়ার সুবিধা।
৩. **শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা :** বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সাধারণ জ্ঞান এবং 'আক্বীদাহ্-মানহাযের উপর বিশেষ ক্লাস। হিফয সম্পন্ন করার পর বয়স ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত ক্লাসে ভর্তি।
৪. **লক্ষ্য :** শিক্ষার্থীদের পূর্ণাঙ্গ হিফয সম্পন্ন করতে সহায়তা করা। শিক্ষার্থীদের জন্য সুশৃঙ্খল, নিরাপদ এবং উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা।

সচেতন অভিভাবকগণকে অনুরোধ করা হলো– দ্রুত যোগাযোগের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য।

**** ইয়াতীম ও অনাথ শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়া সম্পূর্ণ ফ্রি।***

যোগাযোগের ঠিকানা : শেফা আইডিয়াল ইন্সটিটিউট এন্ড অরফানেজ

ফতেপুর কাউন্সিল বাজার, ঝিকরগাছা, যশোর। ✆ **০১৮৯০-৩৩৯৪৩৩**

জমঈয়ত সংবাদ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, সৌদি আরব আল-ক্বাসিম এলাকার কর্মী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সৌদি আরব প্রতিনিধি : বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, সৌদি আরব-এর আল-ক্বাসিম এলাকা শাখার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ কর্মশালা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ০২ জানুয়ারি ২০২৬ ইং, শুক্রবার অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আল-ক্বাসিম বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার অ্যান্ড সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক জনাব তানভীর পারভেজ।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, সৌদি আরব পূর্বাঞ্চলের সেক্রেটারি জেনারেল এবং আল-ক্বাসিম এলাকা জমঈয়তের সভাপতি শাইখ সালেহ আহমদ-এর সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ উযাইর রহমান আল-মাদানী-এর সঞ্চালনায় কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আবূ আদনান শামস পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন। এরপর বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক ও আল-ক্বাসিম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি শাইখ মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম বিন আবুল কালাম আল-কাসিমী স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শাইখ আবূ সাঈদ আফযাল হুসাইন, আল-ক্বাসিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সসহ সদ্য মাস্টার্স সম্পন্নকারী প্রথম বাংলাদেশি শিক্ষার্থী শাইখ আবূ নূরা মাহমুদুল হাসান, সহ-সভাপতি শাইখ মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান, সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ আবূ হিশাম এহসানুল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ শাইখ নাসীরুদ্দীন এবং উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন শাইখ আবূ আহমাদ আব্দুর রাজ্জাক।

এছাড়াও সংগঠনের বিভিন্ন শাখার কার্যকরী পরিষদের অন্তত ৩৫ জন সদস্য কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

বাদ জুমু'আহ্ শুরু হয়ে মাগরিবের কিছু সময় পূর্বে সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

দু'আর আবেদন

সৌদী আরব পূর্বাঞ্চল প্রবাসী জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সম্মানিত সহ-সভাপতি শাইখ এজাজুল হক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে দাম্মামের একটি হাসপাতালে ICU-তে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস সকলের প্রতি মহান আল্লাহর নিকট দু'আর আহ্বান জানাচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যেন তাকে দ্রুত ও পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন।

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء عاجلا غير آجل.

মৃত্যু সংবাদ

০১. **দক্ষিণ বাংলার খ্যাতনামা আলেমে দ্বীন শাইখ অধ্যক্ষ রফিউদ্দীন আনসারী (রাহিমাহুল্লাহ)-র ইন্তেকাল :** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দীর্ঘদিনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও দায়িত্বশীল, দক্ষিণ বাংলার প্রথিতযশা ও খ্যাতনামা বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন শাইখ অধ্যক্ষ রফিউদ্দীন আনসারী (রাহিমাহুল্লাহ) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তিনি গত ১৫ নভেম্বর ২০২৫ বেলা ১২টায় সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শাইখ আনসারী সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলাধীন কাকডাঙ্গা সিনিয়র ফাজিল মাদ্‌রাসার সাবেক অধ্যক্ষ এবং ঝাউডাঙ্গা বাজার আহলে হাদীস জামে মসজিদের দীর্ঘদিনের খতীব ছিলেন। বাহাস ও মুনাযারায় তিনি আহলুল হাদীসদের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

তাঁর ইন্তেকালে মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। একই সঙ্গে মাইয়্যিতের মাগফিরাত ও জান্নাতুল ফেরদাউস কামনায় সকলের নিকট দু'আর আহ্বান জানানো হয়েছে।

০২. রংপুর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি শাইখ আব্দুল মালেক-এর সম্মানিত পিতা গতকাল ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, সোমবার ইন্তেকাল করেছেন।

إنا لله وإنا إليه راجعون.

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস এর উচ্চ মাকাম দান করুন –আল্লাহুমা আমীন।

জমঈয়তের মাননীয় সভাপতি ও সেক্রেটারি জেনারেল তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হতে মাইয়্যিতের জন্য দু'আ– আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন –আমীন। সকলের প্রতি দু'আর অনুরোধ রইল।

০৩. ক্ষিদ্র কালিকাপুর, আত্রাই, নওগাঁ-এর বাসিন্দা নওগাঁ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সম্মানিত সহ-সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মাওলানা জারজিজার রহমানের মাতা গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি., সোমবার ভোর রাতে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। মরহুমা পাঁচ (৫) পুত্র ও চার (৪) কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর পুত্র, জামাতা ও নাতিগণ সকলেই আলেমে দ্বীন।

মাইয়্যিতের মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে সকলের নিকট দু'আ প্রার্থনা করা হয়েছে।

০৪. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত অফিস সহায়ক মো. মাসুদ রানার মাতা দীর্ঘদিন অসুস্থাবস্থায় চিকিৎসাধীন থেকে নিজ বাসভবনে আজ (৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, বুধবার) সন্ধ্যা ০৬ : ১৫ মিনিটে ইন্তেকাল করেছেন।

إنا لله وإنا إليه راجعون.

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস-এর উচ্চ মাকাম দান করুন –আল্লাহুমা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হতে মাইয়িতের জন্য দু'আ– আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন –আমীন। সকলকে দু'আর অনুরোধ রইল।

"সাপ্তাহিক আরাফাতে বিজ্ঞাপন দিন, দা'ওয়াতী প্রকাশনায় অংশ নিন।"

–সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত।

বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

- শেষ প্রচ্ছদ (রঙিন) : পূর্ণ পৃষ্ঠা- ১৫,০০০/-।
- দ্বিতীয় প্রচ্ছদ- (রঙিন) : অর্ধ পৃষ্ঠা- ৭,০০০/-।
- তৃতীয় প্রচ্ছদ- (রঙিন) : পূর্ণ পৃষ্ঠা- ১২,০০০/-, অর্ধ পৃষ্ঠা- ৮,০০০/-।
- ভেতরের পৃষ্ঠা (সাদা কালো) : পূর্ণ পৃষ্ঠা- ৮,০০০/-, অর্ধ পৃষ্ঠা- ৫,০০০/-।

ফাতাওয়া ও মাসায়িল

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদআত, প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ***ফর্‌য ‘ইবাদতে নয়; বরং নফল ‘ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি লাভ করা যায় –এ কথাটি কি হাদীসসম্মত?*** *বনী ইয়ামিন মুরাদনগর, কুমিল্লা।*

জবাব : ফর্‌য ‘ইবাদতে নয়; বরং নফল ‘ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি লাভ করা যায় –এ কথাটি আসলে সঠিক নয়। কেননা ফর্‌য ‘ইবাদতই হচ্ছে মহান আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের সবচেয়ে বড়ো মাধ্যম। যেমন- নবী (ﷺ) হাদীসে কুদসীতে বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ.

“আমার বান্দা যে সব ‘ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাসিল করে থাকে, তার মধ্যে ঐ ‘ইবাদতের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় আর কোনো ‘ইবাদত নেই, যা আমি তার উপর ফর্‌য করেছি”– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৫০২)*। তবে এ কথা সঠিক যে, বান্দার নফল ‘ইবাদত দ্বারা কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং ফর্‌য ‘ইবাদতের ঘাটতি থাকলে নফল ‘ইবাদত দ্বারা সেই ঘাটতি পূরণ করা হবে। সুতরাং ইসলামে নফল ‘ইবাদতেরও বিরাট গুরুত্ব রয়েছে।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***যাকাতের খাত সম্পর্কে আলোচনা করার সময় আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, ﴿وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ﴾। আমার প্রশ্ন হলো, এই খাতে মসজিদ নির্মাণের কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা কি মহান আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার অন্তর্ভুক্ত হবে?***

আলম হুসাইন
শার্শা, যশোর

জবাব : মসজিদ নির্মাণ করা আল্লাহ তা‘আলার বাণী, ﴿وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ﴾-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তাফসীরবিদগণ ‘ফী সাবিলিল্লাহ’র তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে, এ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান আল্লাহর পথে জিহাদ।

আমরা যদি বলি, ‘ফী সাবীলিল্লাহ’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মসজিদ নির্মাণসহ অন্যান্য জনকল্যাণমূলক খাত, তাহলে আল্লাহর বাণী : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾-এর মধ্যে إِنَّمَا দ্বারা যাকাতের খাতগুলোকে সীমাবদ্ধ করার কোনো অর্থ থাকে না। সবাই জানে যে, إِنَّمَا দ্বারা الحصر বা সীমাবদ্ধ করার অর্থ হলো তার পরে উল্লেখিত ব্যক্তি বিশেষের জন্য একটি হুকুম সাব্যস্ত করা এবং সেটা ব্যতীত অন্যদের থেকে সেই হুকুম নাকোচ করা। আমরা যখন বলবো, ﴿وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ﴾ “এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য”। এই আয়াতটি কল্যাণের সমস্ত পথকে শামিল করে, তাহলে সীমাবদ্ধ করার অর্থ প্রদানকারী অব্যয় إِنَّمَا দ্বারা আয়াতটি শুরু করার কোনো উপকারিতা থাকে না। অতঃপর মসজিদ নির্মাণ এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়িয বলা হলে যাকাত শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত করার মহৎ উদ্দেশ্য বাতিল হয়ে যাবে। কেননা কৃপণতা ও লোভ অনেক লোকের মধ্যেই প্রবল থাকে। তারা যখন দেখবে মসজিদ নির্মাণ এবং অন্যান্য সব ধরণের কল্যাণমূলক কাজে যাকাত স্থানান্তর করার সুযোগ রয়েছে তখন তারা সমস্ত যাকাত সে সকল কাজেই ব্যবহার করা শুরু করবে। ফলে ফকীর-মিসকীনরা সর্বদা অভাব অনটনের মধ্যেই রয়ে যাবে।

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***আমাদের অঞ্চলে মৃত ব্যক্তির জানাযার জন্য তৃতীয় দু‘আটি যা– «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، ... وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ» পড়ে থাকি। সেটা মুসনাদ আহমাদ, সুনান আবূ দাউদ, সুনান আত্ তিরমিযী হতে উদ্ধৃত। অথচ সহীহ মুসলিমের হাদীসে যা– «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ ... مِنْ عَذَابِ النَّارِ» পূর্বের দু‘আ থেকে অনেক ভালো। আমার জানার ইচ্ছা যে, রাসূল (ﷺ) যে ব্যক্তির জন্য ২ নং দু‘আ পড়েছিলেন সেটা কি ঐ ব্যক্তির জন্য খাস ছিল না-কি সর্ব সাধারণের জন্য? অথচ ২ নং দু‘আটি সহীহ হাদীসের এবং ১ নং দু‘আটি সুনানের কিতাবসমূহের। তাহলে আমাদের আলেমগণ ২ নং দু‘আটি ব্যবহার করেন না কেন? বিশদ বিবরণ দিবেন।*** *মাশকুরুর রহমান, কুড়িগ্রাম।*

জবাব : «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ... مِنْ عَذَابِ النَّارِ» সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এ দু‘আটি কোনো মৃতের জন্য খাস ছিল না। এটা সকল মুসলিম মৃতের জন্যই পঠনীয়। এটা কারো জন্য খাস হওয়ার কোনো দলিল নেই। তাই বিনা দলিলে কোনো আম বিষয়কে খাস করা যাবে না। আমাদের সমাজের কিছু লোক দু‘টো দু‘আ-ই একসাথে মিলিয়ে পড়ে

আবার অনেকেই কেবল এক নাম্বার দু'আটিই পড়ে। যারা সহীহ মুসলিমের এই মূল্যবান দু'আটি যোগ করে না, তারা সাধারণতঃ এটা পড়ে অভ্যস্থ নয় বলেই পড়ে না। এছাড়া আর কোনো কারণ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***আমাদের সমাজে কবরে লাশ দাফন করার সময় প্রায় প্রত্যেক মুসাল্লীই কবরে তিন মুষ্ঠি করে মাটি দেয় এবং এটাকে সুন্নাত মনে করে। এটা সুন্নাত হওয়ার কোনো দলিল আছে কি? দয়া করে জানাবেন।***

আ. রহীম, সাভার, ঢাকা।

জবাব : মুসলিমের দাফন কাজে শরীক হওয়া মুস্তাহাব। এমনকি কয়েকটি মুষ্ঠি মাটি কবরের উপর রেখে হলেও। নবী (ﷺ) থেকে এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুনান ইবনু মাজাহ্তে বর্ণিত হয়েছে যে,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ)، «صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ، فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا».

"একদা নবী (ﷺ) একটি জানাযায় উপস্থিত হলেন। অতঃপর লাশ কবরে রাখার পর তিনি মৃত ব্যক্তির মাথার দিকে গেলেন এবং কবরের উপর তিন মুষ্ঠি মাটি রাখলেন– *(ইবনু মাজাহ্- ১/৪৯০, মা. শা., ১৫৬৫, সহীহ)*। 'উসমান ইবনু মাযউনের কবরের উপরেও তিনি তিন মুষ্ঠি মাটি রেখেছেন বলে দারাকুত্নীতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সাহাবীদের 'আমল দ্বারাও এটা সাব্যস্ত। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জায়েদ ইবনু সাবেতকে কবরে রাখার পর তার কবরের উপর তিন মুষ্ঠি মাটি রেখেছেন। এ জন্যই সকল মাযহাবের ইমামগণের মতেই লাশ কবরে রাখার পর উপস্থিত লোকদের জন্য কবরের উপর মাটি রাখা মুস্তাহাব। আর তা তিন মুষ্ঠি হওয়াও মুস্তাহাব। কারণ নবী (ﷺ) কবরের উপর তিন মুষ্ঠি মাটি রাখতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু অনেক মৃত ব্যক্তি জানাযায় যেহেতু প্রচুর লোকের সমাগম হয়, তাই ভিড়ের কারণে কেউ যদি কবরের কাছে যেতে না পারে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***আমরা আমাদের বাবার তিনটিই মেয়ে। আমাদের কোনো ভাই নেই। আমার দাদার দেওয়া বা উত্তরাধিকারসূত্রে আমার বাবা কোনো সম্পদ পায়নি। যতটুক সম্পদ করেছে সকল কিছুই আমার বাবা নিজের টাকায় করেছে। যখন সম্পদগুলো করেছে আমাদের পরিবারের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। অনেক কষ্ট করে আমার পিতা সম্পদগুলো করেছে। এখন এই সম্পদ থেকে কি আমার চাচাতো ভাই এবং ফুফাতো ভাইয়েরা অংশ পাবে? আমি এক জায়গা থেকে শুনেছিলাম উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ না পেলে নাকি চাচাতো ভাইয়েরা পায় না।***

মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট।

জবাব : পুত্র বিহীন পিতার সম্পত্তিতে কন্যারা পাবে মূল সম্পদের তিনভাগের দুই ভাগ। এ ক্ষেত্রে যদি মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা জীবিত থাকে, তাহলে কন্যাদের অংশ নেয়ার পর বাকি সম্পদ পিতা-মাতাই পেয়ে যাবেন। আর যদি পিতা-মাতা না থাকেন, কিন্তু ভাই-বোন থাকে, তাহলে বাকি সম্পদ ভাই-বোনেরা পাবে। ভাই-বোন না থাকা অবস্থায় যদি ভাই-বোনের সন্তান থাকে, তাহলে ভাই-বোনের সন্তানরা বাকি সম্পদ পাবে। এখন প্রশ্ন হলো– পিতার কোন্ সম্পদ থেকে তার ভাতিজারা অংশ পাবে? পৈত্রিক সম্পদ হিসেবে যেটা পেয়েছেন, সেখান থেকে? না কি তার নিজের উপার্জিত সম্পদ থেকে?

এর জবাবে আমরা বলবো যে, এভাবে পার্থক্য করার কোনো দলিল নেই। তাই আপনাদের পুত্রবিহীন পিতা যে সম্পদ আপনার দাদা থেকে ওয়ারীস হিসেবে পেয়েছেন অথবা আপনার পিতা নিজে কষ্ট করে উপার্জন করেছে, তার সমুদয় সম্পদেই আপনার চাচাতো ও ফুফাতো ভাইয়েরা ওয়ারীস হবে।

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে কি জুলেখার বিবাহ হয়েছিল এবং জুলেখার যৌবন ফিরে পাওয়ার যে কাহিনী প্রদর্শন করা হয়, তা কতটুকু সত্য? জানিয়ে বাধিত করবেন।***

মাসউদ করীম, কুমিল্লা।

জবাব : এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কোনো 'ইল্ম নেই। বিনা 'ইল্মে কথা বলা মারাত্মক অন্যায়। কোনো কোনো তাফসীরের কিতাবে পরিশেষে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে জুলাইখার বিবাহ হয়েছিল মর্মে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা ইসরাঈলী বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এ বিষয়ে মুফাস্সিরদের অধিকাংশ বক্তব্য আহলে কিতাবদের থেকে নেওয়া হয়েছে। এগুলো বর্জন করাই উত্তম। ইমাম কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, সম্ভবত এসব ঘটনা সহীহ নয়– *(দেখুন : তাফসীর ইবনু কাসীর ও কুরতুবী, সূরা ইউসুফের ব্যাখ্যা)*। এ বিষয়ে জানা বা না জানার সাথে আমাদের কোনো কল্যাণ নেই। যদি কোনো কল্যাণ থাকতো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) আমাদের জন্য তা বর্ণনা করতেন। –ওয়াল্লা-হু 'আলাম।

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***খালা শাশুড়ির জন্য মাহরাম বলে গণ্য হবে? তার সাথে কী হজ্জে যওয়া যাবে? সঠিক উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।*** *রায়হান কবীর, সদরঘাট, ঢাকা।*

জবাব : যে সব কারণে মাহরাম হয়, তার মধ্যে একটি হলো বৈবাহিক সম্পর্ক। যেমন- কোনো মহিলাকে বিবাহ

করলে তার মা, নানী এবং কন্যা, নাতনী বিবাহ করা হারাম– *(সূরা আন্ নিসা : ২৩)*। পক্ষান্তরে বোনের মেয়ের জামাই সেই সংজ্ঞায় পড়ে না। কোনো কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে ঐ জামাতা চাইলে খালা শাশুড়িকে বিবাহ করতে পারে। এজন্য এ ধরনের মাহরামকে অস্থায়ী মহারাম বলা হয়। তাই খালার জন্য বোনের মেয়ের জামাই মাহরাম হয় না। আর যেহেতু মাহরাম হয় না, সেহেতু তার সাথে হজ্জ সফর জায়িয হবে না। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৮) : ***পশ্চিম দিকে পা দিয়ে ঘুমানো যাবে কি? আমাদের সমাজে অনেকেই বলেন– পশ্চিম দিকে পা দেওয়া হারাম। বিষয়টি স্পষ্ট করলে উপকৃত হবো।***

যোবায়ের আহমাদ, কেরাব, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব : এখানে দিক মুখ্য নয়; বরং মূল বিষয় হলো– মহান আল্লাহর ঘর কাবা, যে দিকে আমরা ক্বিবলা করে সলাত আদায় করি। আমাদের এ অঞ্চলের ক্বিবলা হচ্ছে পশ্চিম দিক। তাই পশ্চিম দিকের কথা এখানে এসেছে। ক্বিবলাকে সম্মান করা আমাদের ঈমানের দাবী। তাই সাধারণভাবে ক্বিবলার দিকে পা দিয়ে ঘুমানো বা শোয়া আদবের খেলাফ। যদি ব্যক্তি ও ক্বিবলার মাঝখানে ভেড়া, দেয়াল ইত্যাদি দিয়ে আড়াল করা হয় তাহলে প্রয়োজনে পশ্চিম দিকে পা দিয়ে ঘুমানো জায়িয। মনে রাখতে হবে যে, কোনো অবস্থাতেই ক্বিবলাকে যেন অসম্মান করা উদ্দেশ্য না হয়। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৯) : ***কাউকে জিন্ ধরলে তার চিকিৎসার জন্য কী আমরা তাবিজ ব্যবহার করতে পারবো? আশাকরি সঠিক জবাব দানে বাধিত করবেন।***

আব্বাস উদ্দিন, কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব : কোনো বক্তি চাহে নারী, পুরুষ বা শিশু হোক তাকে জিন্ আসর করলে কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করলেই জিন্ দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾

"আর আমরা কুরআনে এমন কিছু নাযিল করেছি, যাতে শিফা বা রোগমুক্তি এবং মু'মিনগণের জন্য রহমত। আর কাফিরদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বর্ধণ করে না"– *(সূরা ইস্রা : ৮২)*। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শর'ঈ রুকিয়া করতে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি (ﷺ) বলেন :

«اَعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ».

"তোমরা তোমাদের রুকিয়ার বাক্যগুলো আমার কাছে পেশ করো। শির্কী বাক্য না থাকলে রুকিয়া করতে কোনো অসুবিধা নেই"– *(সহীহ মুসলিম- হা. ২২০০)*। উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআনের আয়াত পড়ে কিংবা শরিয়তসম্মত রুকিয়া দ্বার জিন্ের আক্রমণ গ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা করা যায়। এ ক্ষেত্রে তাবিজ ব্যবহার করা কোনোভাবে জায়িয হবে না। কেননা এটি শির্ক। আর কোনো মুসলিম শির্ক করতে পারে না; যদিও তার মৃত্যু হয়। এ মর্মে রাসূল (ﷺ) বলেন :

لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ.

"তুমি আল্লাহর সাথে শির্ক করো না, যদিও তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয় কিংবা আগুনে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়"– *(সহীহুত্ তারগীব- আলবানী, হা. ৬৭১)*। আর তাবিজ শির্ক সম্পর্কে তিনি (ﷺ) বলেন :

«إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ».

"নিশ্চয়ই (কুফ্রী) ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-তুমার ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মুহব্বত সৃষ্টির জন্য যা কিছু ব্যবহার করা হয়, তা শির্ক"– *(আবূ দাউদ- হা. ৩৮৮৩ ও ইবনু মাজাহ- ৩৫৩০, আস্ সহীহাহ্- আলবানী, হা. ৩৩১ ও ২৯৭২)*। অপর হাদীসে বলেন :

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ.

"যে তাবিজ ঝুলালো সে শির্ক করলো"– *(মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৬৯৬৮, মা. শা., হা. ১৭৬৯৪ ও আল-বানী 'আস্ সহীহাহ্- হা. ৪৯২)*। অতএব শরিয়তসম্মত রুকিয়া বা চিকিৎসা গ্রহণ করুন! মনে রাখবেন, কোনো অবস্থাতে তাবিজ ব্যবহার করা যাবে না। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১০) : ***আমরা 'উমরাহ্ সফরে যাওয়ার নিয়ত করেছি। আমার নিয়মিত মাসিক স্রাব-এর সর্বোচ্চ সময়সীমা ০৭ (সাত) দিন। এই নিয়মের ব্যতিক্রম কখনও লক্ষ্য করিনি। তবে 'উমরার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ নেকির সফরে যাওয়ার আগে জেনে নিতে চাই– যদি সফরকালে মাসিকের এ নিয়মের খেলাফ ঘটে এবং ০৭ (সাত) দিনের বেশি সময় স্রাব চলে, তাহলে আমি কি তাওয়াফ করতে পারব? দলিল-প্রমাণসহ জানাবেন।*** *নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*

জবাব : আপনার নিয়মিত মাসিক স্রাবের সময়কালে আপনি তাওয়াফ, সলাত ও সিয়াম পালন করতে পারবেন না। সর্বোচ্চ সময় ০৭ (সাত) দিন পার হওয়ার পর নিয়মের বাইরে যে স্রাব হবে, তা বিশেষ রোগ হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় আপনি মাসিক স্রাবকাল পার হওয়ার পর গোসল করে পবিত্র হয়ে তাওয়াফ ও সলাত ইত্যাদি 'ইবাদত নিয়মতান্ত্রিকভাবে করতে পারবেন। এরূপ প্রশ্ন মহিলা সাহাবী উম্মু হাবীবাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তদুত্তরে রাসূল (ﷺ) বলেন :

اَمْكُثِيْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ.

"তুমি মাসিক স্রাব সময় পরিমাণ সলাত, সিয়াম হতে বিরত থাকবে। অতঃপর গোসল করবে এবং সলাত আদায় করবে"– *(মুসলিম- ৩৩৪, সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৭৮, সহীহ ও সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২০৭, সহীহ)*। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১১) : ***কোনো ব্যক্তি বেশি বেশি নফল 'ইবাদত করলে তার কান মহান আল্লাহর কান হয়ে যায়, তার চোখ মহান আল্লাহর চোখ হয়ে যায়, তার হাত ও পা আল্লাহ হাত ও পা হয়ে যায় –এ হাদীসের মর্মার্থ কী?***

আহসান হাবীব, গৌরনদী, বরিশাল।

জবাব : হাদীসে কুদসীতে এসেছে। নবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

«مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِيْ عَنْ قبض نَفْسِ عبدي الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ولا بد له منه».

"যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো। আমার বান্দা যে সব 'ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাসিল করে থাকে, তার মধ্যে ঐ 'ইবাদতের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় আর কোনো 'ইবাদত নেই, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। বান্দা নফল 'ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার এতটুকু নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, যার কারণে আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। আমি যখন তাকে ভালোবাসতে থাকি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যার মাধ্যমে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে স্পর্শ করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে চলাফেরা করে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা দিয়ে দিই। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে আশ্রয় প্রদান করি। আমি আমার মুমিন বান্দার জান বের করতে যতটা দ্বিধা-সংকোচ করি, অন্য কোনো কাজ করতে গিয়ে ততটা দ্বিধা-সংকোচ করি না। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে দীর্ঘ হায়াত দিয়ে অতি বৃদ্ধ করে কষ্ট দেয়াকে অপছন্দ করি– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৬৫০২)*।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দার কান, চোখ ইত্যাদি হওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য কি? উত্তর হচ্ছে বান্দা যখন আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য তাঁর 'ইবাদতে মগ্ন হয়ে যায় এবং 'ইবাদত করতে করতে তার ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হয়, তখন তার শরীরের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরিয়তের অনুগামী হয়ে যায়। তখন কান দিয়ে শুধু আল্লাহর আনুগত্যের কথাই শুনে এবং তা দিয়ে কোনো হারাম নিষিদ্ধ আওয়াজ শুনার চিন্তাও করে না। চোখ দিয়ে শুধু মহান আল্লাহর পছন্দনীয় জিনিসই দেখে। হাত দিয়ে শুধু ভালো জিনিসই স্পর্শ করে এবং পা দিয়ে শুধু আনুগত্যের পথেই চলে। এক কথায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সন্তুষজনক কাজ করার তাওফীক্ব দিয়ে থাকেন। -ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১২) : ***ফেসবুকে একটি পোস্ট দেখলাম, ৭টি কাজ করলে মানুষ দরিদ্র হয়ে যাবে। যেমন- ১. দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে, ২. তাড়াহুড়ো করে নামায পড়লে, ৩. বাথরুমে ওযূ করলে, ৪. দাঁড়িয়ে পানি পান করলে, ৫. ফুঁ দিয়ে বাতি (যেমন- মোমবাতি) নিভালে, ৬. দাঁত দিয়ে হাতের নখ কামড়ালে এবং ৭. পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা মুখমণ্ডল মুছলে। বিষয়গুলো কি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? এগুলোর উপর বিশ্বাস রাখলে ঈমানের ক্ষতি হবে কি-না?***

জোবায়ের আহমদ, ময়মনসিংহ।

জবাব : এগুলো সবই বানোয়াট কথা। ফেসবুকে এ ধরনের অনেক পোস্ট দেখতে পাওয়া যায়। এ সব থেকে বেঁচে না চললে, ঈমান হারানোরও সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। তবে নির্ভরয়োগ্য আলেমদের বক্তব্য শুনাতে কোনো অসুবিধা নেই।

জিজ্ঞাসা (১৩) : ***সপ্তম দিনে শিশুর চুল কাটা কি প্রয়োজনীয়? ডাক্তারগণ কখনও এমনটি নিষেধ করে থাকেন। এমতাবস্থায় করণীয় কি?*** *আবুল হাসান*

পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

জবাব : সপ্তম দিনে শিশু সন্তানের চুল কাটা সুন্নাহ। এই মর্মে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন–

«كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى».

"প্রত্যেক শিশু সন্তান 'আক্বীক্বার কারণে বন্ধক থাকে, সপ্তম দিনে তা জবাই করা হবে, সেইদিন তার নাম রাখা হবে এবং মাথার চুল কাটা হবে।" *(সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ১৫২২, সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩৮৩৮, মা. শা., হা. ২৮৩৮, আলবানী সহীহ)* তবে অসুস্থতাজনিত কারণে সপ্তম দিনে চুল কাটা ডাক্তার বারণ করলে তা ভিন্ন কথা। তবে চুল কাটা পুত্র শিশুর জন্য খাস। উলামাগণ ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্ দায়িমায় বলেন–

لا يشرع حلق رأس المولود إذا كان أنثى.

মেয়ে শিশুর চুল কাটা বিধিসম্মত নয়। *(ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্ দায়িমাহ- ১০/৪৬৮)*

জিজ্ঞাসা (১৪) : ***আমি আসন্ন হজ্জে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমার কিছু ঋণ থেকে যাচ্ছে –যা আমি ধীরে ধীরে মেটাতে পারব ইন্‌শা-আল্লাহ। আমার ঋণের পাওনাদাররাও আমাকে চাপ দেবে না। এমতাবস্থায় আমার উক্ত ঋণ কি আমার হজ্জে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা হবে?*** *আ. গফুর, তালা, সাতক্ষীরা।*

জবাব : আপনার ঋণভার থাকলে ঋণ পরিশোধ করা হজ্জের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। মানুষের পাওনা আদায় করা এবং ঋণ মুক্ত হওয়া ওয়াজিব। তবে আপনি যেভাবে বলেছেন। তাতে বুঝা যায় আপনার ঋণগুলোর একটা শৃঙ্খলা ও চাপমুক্ততা আছে। এমতাবস্থায় আপনার আত্মবিশ্বাস এবং পাওনাদারদের সাথে আপনার বুঝাপড়া যদি এমন হয় যে, আপনি হজ্জে থেকে এসে ঋণগুলো শোধ করে দেবেন, তাহলে আপনার হজ্জ সম্পন্ন করতে ইন্‌শা-আল্লাহ কোনো বাধা নেই। *(মাজমূ ফাতাওয়া ইবনু উসাইমিন- ২১/৯১ পৃ.)* এমতাবস্থায় আপনি হজ্জ করুন এবং পরে সঠিকভাবেই ঋণগুলো শোধ করে দিন।

জিজ্ঞাসা (১৫) : ***আমি মাঝে মাঝেই ভয়ঙ্কর কিছু স্বপ্ন দেখি। এ জন্য আমি ঘুমানোর দু'আ পাঠ করে নিদ্রা যাই। এখন আমার করণীয় কি? ঘুমানোর দু'আর সাথে কি অন্য কিছু পাঠ করতে হবে?*** *আহসানুত্ তাকবীম, ময়মনসিংহ সদর।*

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, স্বপ্ন সাধারণত তিন প্রকার। আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ, মনের চিন্তা-ভাবনা অথবা শয়তানের পক্ষ হতে ভয় দেখানো। অতএব কেউ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে সে ইচ্ছা করলে কাউকে বলতে পারে। আর যদি খারাপ কিছু দেখে তাহলে কাউকে বলবে না এবং ঘুম থেকে উঠে সলাত আদায় করবে। *(সহীহ আল জামি'- ৩৫৩৩)*

অন্য হাদীসে এসেছে– খারাপ স্বপ্ন দেখলে খারাপ-ই হতে এবং শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে এবং তিনবার থু থু ফেলবে আর এ স্বপ্ন কারো কাছে বলবে না, তার কোনো ক্ষতি হবে না। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭০৪৪)*

জিজ্ঞাসা (১৬) : ***জানাযার সলাতের দু'আয়ার মধ্যে পাঠ করা হয়– "ওয়া যাওজান খাইরাম মিন যাওজিহী" এবং তাকে স্ত্রীর পরিবর্তে উত্তম স্ত্রী দান করুন। আমার প্রশ্ন হলো– মাইয়্যিত মহিলা হলে দু'আ কীভাবে পাঠ করতে হবে?*** *আব্দুল বারী, ঝিকরগাছা, যশোর।*

জবাব : আরবী ভাষায় (زوج) যাউজ শব্দটি জোড়া বা যুগল অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং মাইয়্যেত মহিলা হলে যাউজ দ্বারা পুরুষ উদ্দেশ্য, আর মাইয়্যেত পুরুষ হলে যাউজ দ্বারা মহিলা উদ্দেশ্য হয়। অতএব স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে একই দু'আ পড়তে হবে।

জিজ্ঞাসা (১৭) : ***আমি জানতে চাই ইসমে আযমের দু'আ কোনটি এবং এর ফযীলত কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।*** *ফারহানা আক্তার, উত্তরা, ঢাকা।*

জবাব : ইসমে আযম অর্থাৎ- "অধিক মহান নাম"-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করা। আল্লাহ তা'আলার সকল নামই সুন্দর ও মহান, তবে কোন্‌টি অধিক মহান এ বিষয়ে একাধিক বক্তব্য রয়েছে যা নিম্নরূপ *(আসমাউল্লাহিল হুসনা ফিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ- ১/১৯৭-২০৫ পৃ)* : **(ক)** অধিকাংশ বিদ্বান মনে করেন "الله" নামটি ইসমে আযম। অতএব "الله" নাম দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা। **(খ)** ইসমে আযম হচ্ছে– "الرحمن الرحيم"। **(গ)** ইসমে আযম হচ্ছে– "الحي القيوم"। **(ঘ)** ইসমে আযম হচ্ছে– "الأحد الصَّمَدُ"।

এ মর্মে কিছু বর্ণনা রয়েছে। যেমন- আসমা বিনতু ইয়াযীদ নবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : ইসমে আযম ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ এবং সূরা আ-লি 'ইমরান-এর শুরু ﴿الم اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾ এ দু'টি আয়াতে রয়েছে। *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৪৯৬; আত্ তিরমিযী- হা. ৩৪৭৮; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৮৫৫, সহীহ)*

সাহাবী আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেন : ইসমে আযম, যার মাধ্যমে দু'আ করলে দু'আ কবুল হয়। সে ইসমে আযম তিনটি সূরায় রয়েছে। তাবেঈয়ী আল কাসিম বলেন : আমি সূরাগুলোতে খুঁজে পেলাম। সূরা আল বাক্বারাহ, ২৫৫ নং আয়াত– ﴿اَللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾। আ-লি 'ইমরান, ২ নং আয়াত– ﴿الم اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾। ত্ব-হা-, ১১১ নং আয়াত– ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ﴾। অর্থাৎ- ইসমে আযম "الحي القيوم"। *(আবূ দাউদ- হা. ১৩২৭, ইবনু মাজাহ্- ৩৮৪৬, সহীহাহ্- হা. ৭৪৬)*

বুরাইদাহ্ আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : নবী (ﷺ) এক ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত বাক্য দ্বারা দু'আ করতে শুনেছেন,

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ أَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ».

অতঃপর বলেন :আল্লাহর কসম করে বলছি! সে আল্লাহর কাছে তাঁর ইসমে আযম অধিক মহান নামের মাধ্যমে প্রার্থনা করেছে। এটা এমন নাম যার মাধ্যমে দু'আ করলে কবুল হয় এবং কিছু চাইলে পাওয়া যায়। *(আবূ দাউদ- হা. ১৩৪১, মা. শা., হা. ১৪৯৩, সহীহ; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৮৫৭)*

উপরোক্ত হাদীসসমূহের আলোকে বুঝা যায় "ইসমে আযম" একাধিক হতে পারে। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১৮) : ***যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকেন তাদের কেউ কেউ নিজ ইচ্ছামত মার্কেটে যান কিংবা অন্যত্র গমন করেন। আমার প্রশ্ন হলো– নারীরা স্বামীর অনুমতি ছাড়া ইচ্ছামত যত্রতত্র গমন করতে পারেন কি না?***

মো. আবূ জাফর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

জবাব : বিশেষ প্রয়োজনে নারীর বাইরে গমন করতে হলে বিবাহিতা নারীর বেলায় স্বামীর অবগতি ও অনুমতি থাকা প্রয়োজন। ফিতনা ও পাপাচারপূর্ণ স্থানে গমন থেকে তাকে বিরত থাকতে হবে। নারীর সার্বিক কর্মকাণ্ড ও চলাচলে তার স্বামীর কর্তৃত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ বলেন,

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾

"পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্বশীল, কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।" *(সূরা আন্-নিসা : ৩৪)* নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾

"নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২২৮)*

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় হতে প্রমাণিত হয় যে, নারী তার অধিকার লাভ করবে বটে, কিন্তু সে কাজকর্মে স্বেচ্ছাচারী এবং চলাফেরায় যথেচ্ছাচারী হতে পারবে না। এসবে অবশ্যই তাকে তার স্বামীর নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে হবে। অন্যথায় ফিতনা, অশ্লীলতা এবং পরকিয়ার মতো নোংরা ব্যাধি সমাজে ব্যাপক হয়ে উঠবে।

জিজ্ঞাসা (১৯) : ***সলাতে রত অবস্থায় কোন ব্যক্তির ওযূ ছুটে গেলে সে মুক্তাদিদের সামনে দিয়ে কিভাবে আসবে? দলিলসহ জানাবেন।*** *আতাউর রহমান*
খত্বিব- মনিপুর বাজার জামে মসজিদ, গাজীপুর।

জবাব : সলাতে যার ওযূ ভেঙ্গে যায় সেই মুসল্লী যেই কাতারেই থাকুক তার করণীয় হলো সলাত ছেড়ে বের হয়ে আসা। নবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন–

«لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».

"তোমাদের যার ওযূ ছুটে যায়, তার সলাত আল্লাহ তা'আলা কবূল করেন না, ওযূ না করা পর্যন্ত।" *(বুখারী- হা. ৬৪৪০, ৬৯৫৪; মুসলিম- হা. ৩৩০)*

নবী (ﷺ) আরো বলেন–

«فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا».

অর্থ : "আওয়াজ না শুনলে অথবা গন্ধ না পেলে সলাত থেকে সরবে না।" *(সহীহুল বুখারী- ১/৪৩, হা. ১৭৭)*

জামা'আতে ইমাম মুক্তাদীগণের সুতরা হন। জামা'আতে সলাত চলাকালীন সময়ে কোন মুসল্লির ওযূ ছুটে গেলে সেই মুসল্লী প্রয়োজনে অন্যান্য মুসল্লীগণের সম্মুখ দিয়ে মসজিদের বাইরে আসবেন। এই মর্মে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মুসল্লীগণের সম্মুখ দিয়ে জামা'আতের সময় অতিক্রম করার হাদীসটি প্রণিধান যোগ্য।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِيْ الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মাক্কা বিজয়ের সময়) যখন আমি বালেগ হওয়ার নিকটবর্তী; সে সময় আমি একটি মাদী গাধার উপর সওয়ার হয়ে এসেছিলাম। দেয়াল ছাড়া অন্য কোন কিছুর দিকে নবী (ﷺ) মিনায় সাহাবাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করেছিলেন। আমি সওয়ারীর উপর আরোহণ করে কাতারের কিছু অংশের সম্মুখ দিয়ে চলে গেলাম, তারপর সওয়ারী থেকে অবতরণ করে সেটিকে চরাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে কাতারে দাঁড়িয়ে গেলাম, কিন্তু আমার এ কাজে কেউই অসম্মতি জ্ঞাপন করেননি। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৪৯৩)*

জিজ্ঞাসা (২০) : ***দাঁড়ি ও চুলে কালো খিজাব দেওয়া যাবে কি? বর্তমানে অনেকেই কালো খিজাব দ্বারা দাঁড়ি ও চুল রঙ্গিয়ে থাকেন। এটি কতখানি শরী'আত সম্মত? দলিল সহকারে জানতে চাই।*** *নজরুল ইসলাম, শুব্বান কর্মী, যশোর।*

জবাব : চুল-দাঁড়ি পেকে গেলে মেহদী দ্বারা রং পরিবর্তন করা জায়িয। সাধারণতঃ কালো খিজাব ব্যবহার নিষিদ্ধ। কেননা, রাসূল (ﷺ) বলেন :

«غَيِّرُوْا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوْا السَّوَادَ».

"এই (সাদা চুল-দাঁড়ির রং) কিছু দিয়ে বদলে দাও! আর কালো খিজাব হতে দূরে থাকো!" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৫৬৩১)* কালো খিজাব লাগালে বেহেশ্‌তের সুগন্ধি হতে বঞ্চিত হবে। *(আবূ দাঊদ- ৪২১৪, সহীহ; আন্ নাসায়ী- ৫০৭৫, সহীহ)*

জিজ্ঞাসা (২১) : ***ওযূ করার পর কোন কোন সময়ে আমার মনে হয়, একটু প্রস্রাব বের হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমি খুব পেরেশানীতে আছি। এই বিষয়ে আমার করণীয় জানাবেন।*** *মো. নজরুল ইসলাম, যশোর, কেশবপুর।*

জবাব : আপনি ওযূ করে পবিত্রতা অর্জন করার পর আপনার প্রস্রাবের সন্দেহের কারণে আপনার ওযূতে কোনোরূপ প্রভাব পড়বে না। কেননা সন্দেহের কারণে সুদৃঢ় বিশ্বাসের বিষয়টি বাদ পড়তে পারে না। মহানবী (ﷺ)-এর কাছে কোনো ব্যাক্তি সলাতে ওযূ টুটে যাওয়ার সন্দেহের কথা জানালে মহানবী (ﷺ) বলেন,

«لَا يَنْصَرِفْ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا».

"আওয়াজ না শুনে, অথবা গন্ধ না পেয়ে সলাত ছাড়বে না।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৩৭; সহীহ মুসলিম- হা. ৩৬১)*

এ হাদীস স্পষ্টতই প্রমাণ করে নিছক সন্দেহ প্রবণতা ওযূ ভঙ্গের কারণ হবে না, সুদৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত। সুতরাং আপনি প্রস্রাব বের হওয়ার সন্দেহকে গুরুত্ব দেবেন না; বরং ওযূ বিদ্যমান আছে বলেই জানবেন।

জিজ্ঞাসা (২২) : ***দু'জন ব্যক্তি জামা'আত করে সলাত আদায় করার সময় ডানপাশে দাঁড়ানো মুক্তাদি ব্যক্তি কি একটু পিছনে দাঁড়াবে, নাকি ইমামের সাথে দাঁড়াবে?*** *আহসান কাবীর, আব্দুল্লাহপুর, রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও।*

জবাব : দু'জনে জামা'আত করে সলাত আদায়কালে দু'জন পুরুষ-নারী (ভিন্ন) না হলে অবশ্যই মুক্তাদি ব্যক্তি ইমামের সাথে মিলিতভাবে দাঁড়াবে। একটু পেছনে হয়ে দাঁড়ানোর কোন সুযোগ নেই। নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : «لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ».

"তোমরা সলাতের কাতারে সমানভাবে মিলিত হয়ে দাঁড়াবে, অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে অনৈক্য করে দেবেন।" *(বুখারী- হা. ৬৭৬, মা. শা., হা. ৭১৭)*

উপরোক্ত অবস্থায় ইমাম ও একজন মুসল্লী মিলে কাতার হবে, যাতে কোনরূপ অসমান থাকতে পারবে না।

ইমাম সালেহ আল উসাইমিন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "কাতারের সমান করা হলো একজন আরেকজনের আগে হবে না।"

(আশ্ শারহিল মুমতি- ৩/১০)

জিজ্ঞাসা (২৩) : ***দা'ওয়াত ও তাবলিগী কাজে সহযোগীতার বিধান ও মর্যাদা কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।*** *মো. নজরুল ইসলাম, শুব্বান কর্মী, কেশবপুর, যশোর।*

জবাব : প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির জন্য ইসলামি দা'ওয়াত ও তাবলীগী কাজে সহযোগীতা করা একান্ত করণীয়, তবে সেই দা'ওয়াত ও তাবলীগ হতে হবে খাঁটি ও নির্ভেজাল। বিদ'আতী দা'ওয়াত ও তাবলীগী কাজে সহযোগিতা করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন,

﴿وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"সৎকর্ম ও তাক্বওয়ামূলক কাজে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে সহযোগীতা করবে না।" *(সূরা আল-মায়িদাহ : ২)*

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন,

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ○ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

"নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্থতার মধ্যে নিমজ্জিত। তবে তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।" *(সূরা আল-'আসর : ২ ও ৩)*

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দা'ওয়াতই হলো প্রকৃত হক্বের দা'ওয়াত। এর অশেষ মর্যাদা রয়েছে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে ডাকে তার জন্য এ পথের অনুসারীদের বিনিময়ের সমান বিনিময় রয়েছে। এতে তাদের বিনিময় কিছুমাত্র কমবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথের দিকে ডাকে, তার উক্ত পথের অনুসারীদের গুনাহের সমান গুনাহ হবে। এতে তাদের গুনাহ কিছুমাত্র কমবে না।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৬/২৬৭৪)*

পাঠক কুইজ : পর্ব– ০১

১. ইমাম ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ) কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন? **উত্তর :**

২. লালমনিরহাটে সাহাবীদের আমলে নির্মিত মসজিদটি কত সালে কত সালে পুনরুদ্ধার করা হয়? **উত্তর :**

৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রকৃত নাম কি? **উত্তর :**

৪. ওয়্যার সিমিট্রি কি এবং কোথায় কোথায় অবস্থিত? **উত্তর :**

৫. জুলকারনাইন কে ছিলেন? **উত্তর :**

কুপন

দা'ওয়াতি কাজের অসামান্য ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"আল্লাহর শপথ! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কোন একজন লোককে হিদায়াত দিলে সেটা তোমার জন্য (মূল্যবান) লাল উটের চেয়েও কল্যাণকর।" *(বুখারী- হা. ৩৭০১ ও সহীহ মুসলিম- হা. ৩৪/২৪০৬)*

সুতরাং শির্ক-বিদ'আত মুক্ত প্রদর্শনী বিহীন কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দা'ওয়াতী কাজে সর্বোত সহযোগিতা একান্ত করণীয় ও অশেষ মর্যাদার কাজ।

জিজ্ঞাসা (২৪) : ***নারীদের অনেকেই রাগের বশে স্বামীর কাছে তালাক চায় কিংবা কাজীর কাছে গিয়ে ডিভোর্স করিয়ে নেয়, এই কাজ কতটা শরী'আতসম্মত।***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, শীলমান্দি, নরসিংদী।

জবাব : যথোপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে রাগ জনিত কিংবা পরকিয়া জনিত ইত্যাদি কারণে কোনো নারীর স্বামীর কাছে তালাক দাবি করা বৈধ নয় এবং ডিভোর্সের আশ্রয় নেয়াও মারাত্মক অবৈধ কর্ম। সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ».

"নিরর্থক যে নারী স্বামীর কাছে তালাক চায় তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম।" *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২২২৬)*

জিজ্ঞাসা (২৫) : ***এক মহিলা তার স্বামীর মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর বিবাহ করে নেয়, আমি জানতে চাই, তার এই বিবাহ কি শুদ্ধ হয়েছে?*** *আবু বকর, আব্দুল্লাহপুর, রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও।*

জবাব : উপরে বর্ণিত অবস্থায় যদি স্বামীর মৃত্যুর পর মহিলার সন্তান প্রসব হয়ে থাকে আর তার পরপরই বিবাহটি হয়ে থাকে তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। কারণ হলো, সন্তান প্রসব করা বিধবা নারীর জন্য ইদ্দত হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "গর্ভবতীদের ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত।" *(সূরা আত্-ত্বালা-ক্ব : ৪)*

এতদভিন্ন বিধবা নারীর জন্য ইদ্দতের সময়সীমা হলো চারমাস দশ দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"তোমাদের মধ্য হতে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মারা যাবে সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন বিরত রাখবে। তারপর যখন তাদের ইদ্দৎকাল পূর্ণ হবে, তখন তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধে বৈধভাবে যা কিছু করবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে বিষয়ে পরিজ্ঞাত।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ : ২৩৪)*

আল্লাহর নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত ইদ্দত পালন না করে তার পূর্বে কোনো নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকলে তার বিবাহ বাতিল হবে। তাদের নারী-পুরুষ মেলামেশা যেনা ব্যভিচার বলে গণ্য হবে এবং এই অবৈধ বিবাহ অবশ্যই ভেঙ্গে দিতে হবে। *(আল মুসিয়াতুল ফিকহিয়্যা- ২৯/৩৪৬)*

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষা ও যত্নের প্রতিশ্রুতি!

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস **কেন্দ্রীয় ইয়াতিমখানায়** ছাত্র ভর্তি চলছে। ঢাকার সন্নিকটে সুবিস্তীর্ণ জমঈয়ত ক্যাম্পাসে অবস্থিত আমাদের **ইয়াতিমখানায়** আপনার সন্তান বা অধীনস্থ ইয়াতিম শিশুকে ভর্তি করার সুযোগ রয়েছে।

নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশে পারিবারিক আবহে শিশুদের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের জন্য আমরা এক সুশৃঙ্খল এবং সুরক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত করি।

শিক্ষার ধরণ : ধর্মীয় শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়। **শিক্ষার্থী বয়স :** ৫-১২ বছর।

আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথি : জন্মনিবন্ধন সনদ, অভিভাবকের পরিচয়পত্র।

যোগাযোগের ঠিকানা : বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, কেন্দ্রীয় ইয়াতিমখানা, কাইচাবাড়ি, বাইপাইল, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

০১৭১১৬৮৬২২২

কুইজে অংশ নেওয়ার জন্য সাপ্তাহিক আরাফাতে প্রকাশিত 'পাঠক কুইজ' কুপনটি কেটে

প্রাপক,

সাপ্তাহিক আরাফাত, জমঈয়ত ভবন,

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

কুইজে বিজয়ীদের নাম **সাপ্তাহিক আরাফাত**-এর পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে পাশাপাশি ওয়েবসাইটেও দেওয়া হবে। বিজয়ীদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বাছাই করে ৩ জনকে দেওয়া হবে আকর্ষণীয় পুরস্কার!

প্রচ্ছদ পরিচিতি :

জামিয়া সালাফিয়া ফয়সালাবাদ

আব্দুল মোহাইমেন সাআদ

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের ফয়সালাবাদ শহরের ব্যস্ততা, শিল্পাঞ্চলের কোলাহল ও নগরজীবনের ভিড়ের মাঝেই নীরবে দাঁড়িয়ে আছে এক জ্ঞানতীর্থ-জামিয়া সালাফিয়া ফয়সালাবাদ। বহিরঙ্গে সাধারণ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনে হলেও, এর ভেতরে লুকিয়ে আছে আহলে হাদিসদের ইতিহাস, দাওয়াহর সংগ্রাম এবং শত শত আলেমে দ্বীনের গড়ে ওঠার গল্প। এটি কেবল একটি মাদরাসা নয়; বরং এটি উপমহাদেশের সালাফি চিন্তা ও হাদিসভিত্তিক শিক্ষার এক জীবন্ত দলিল।

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের তৎকালীন লাইলপুর (বর্তমান ফয়সালাবাদ)-এ পাকিস্তান জমিয়তে আহলে হাদীস-এর বার্ষিক সম্মেলনে একটি পূর্ণাঙ্গ দারুল উলুম প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই স্বপ্ন বাস্তব রূপ নেয় ৪ এপ্রিল ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে, যখন শহরের বিশিষ্ট বুযুর্গ হাকিম নূরুদ্দিন (রাহিমাহুল্লাহ) এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। নামকরণের প্রস্তাব আসে মাওলানা মুহাম্মদ হানিফ নদভী (রাহিমাহুল্লাহ)'র কাছ থেকে "জামিয়া সালাফিয়া" যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং সময়ের পরীক্ষায় এক অনন্য পরিচয়ে পরিণত হয়।

ফয়সালাবাদ শহরের শেখুপুরা রোডের হাজিয়াবাদ মহল্লায় অবস্থিত সাড়ে চার একর আয়তনের এই প্রতিষ্ঠান আজ একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাকেন্দ্র। মসজিদ, শ্রেণিকক্ষ, ছাত্রাবাস, লাইব্রেরি হল, ফয়সাল হল, ডাইনিং হল, গেস্ট হাউস, ডিসপেনসারি-সব মিলিয়ে এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্বীনি ক্যাম্পাস। এখানকার প্রতিটি ইট যেন সাক্ষ্য দেয় ইখলাস, ত্যাগ ও নিরলস পরিশ্রমের।

জামিয়া সালাফিয়ার প্রতিষ্ঠাতাদের তালিকায় রয়েছেন উপমহাদেশের খ্যাতিমান আলেমগণ– মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ দাউদ গজনভী, শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল সালাফী, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মিঞা মুহাম্মদ বাকির, হাকিম নূরুদ্দিন (রাহিমাহুল্লাহ) প্রমুখ। তাঁদের হাত ধরেই গড়ে ওঠে একটি সুসংগঠিত প্রশাসনিক কাঠামো। সময়ের প্রয়োজনে নেতৃত্ব বদলেছে, কিন্তু আদর্শ বদলায়নি। মিয়া ফজল হক (রাহিমাহুল্লাহ)- এর দীর্ঘ সভাপতিত্ব এবং পরবর্তীতে মিয়া নঈম-উর-রেহমানের দায়িত্ব গ্রহণ এই ধারাবাহিকতারই প্রমাণ।

শিক্ষাক্ষেত্রে জামিয়া সালাফিয়া বরাবরই ছিল ব্যতিক্রমী। দারস-ই-নিযামির পাশাপাশি হাদিসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক শক্তিশালী পাঠক্রম। বিভিন্ন সময়ে শায়খুল হাদিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন– হাফেজ মুহাদ্দিস গোঁদলভী (রাহিমাহুল্লাহ), হাফেজ সানাউল্লাহ মাদানী (রাহিমাহুল্লাহ), হাফেয মাসউদ আলম (রাহিমাহুল্লাহ) এবং বর্তমানে মাওলানা হাফেজ আব্দুল আজিজ আলভী-যাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের ইল্‌ম, তাক্বওয়া ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠানের মানকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন।

এখানকার শিক্ষা পরিচালনা ও প্রশাসনে যাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের অবদান ছাড়া জামিয়া সালাফিয়ার ইতিহাস অসম্পূর্ণ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক মুহাম্মদ ইয়াসিন জাফর-যাঁর দীর্ঘ চার দশকের নেতৃত্বে শিক্ষা ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়, পাঠ্যক্রম আধুনিকায়ন হয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জামিয়ার পরিচিতি বিস্তৃত হয়। তাঁর 'আমলেই মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সমমানপ্রাপ্ত সনদের স্বীকৃতি লাভ করে জামিয়া সালাফিয়া।

এই প্রতিষ্ঠান থেকে আজ পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক আলেমে দ্বীন ফারিগ হয়ে বের হয়েছেন, যাঁরা দেশে-বিদেশে দাওয়াহ, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের কাজে নিয়োজিত। ওয়াফাকুল মাদারিস সালাফিয়া-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় এখানেই অবস্থিত-যা এর প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্বকে আরো সুদৃঢ় করে।

সময়ের প্রবাহে অনেক কিছু বদলায়, কিন্তু কিছু প্রতিষ্ঠান ইতিহাস হয়ে ওঠে। জামিয়া সালাফিয়া ফয়সলাবাদ তেমনই এক প্রতিষ্ঠান– যেখানে অতীতের ঐতিহ্য, বর্তমানের দায়িত্ব ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন একসূত্রে গাঁথা। ইলমের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার এই নিরব সাধনা আজও চলমান, ইন্ শা-আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর প্রকাশিত বইসমূহ

ক্র. নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
০১	১. কালেমা তাইয়্যেবা, ২. আহলে হাদীস পরিচিতি, ৩. নবুওয়াতে মুহাম্মাদী, ৪. সিয়ামে রামাযান, ৫. তারাবীহ, ৬. ঈদে কুরবান, ৭. তিন তালাক প্রসঙ্গ, ৮. ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি, ৯. মুরগী আগে জন্মেছে না ডিম	আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী
০২	বিশিষ্ট গবেষকদের কলমে, আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ)'র জীবনী	ড. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
০৩	ধর্ম বিজ্ঞান প্রগতি	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী
০৪	১. বুলূগুল মারাম, ২. কিতাবুল কাবায়ির	অনুবাদ : মাও. আব্দুর রহমান
০৫	নূরুল ঈমান	মূল : মাও. আব্বাস আলী মুর্শিদাবাদী
০৬	ইসলামের আলোকে জীবন বিধান	মুহাম্মদ আবুল হোসেন
০৭	নবুওয়াতী যুগে ইসলাম প্রচারে নারীদের অবদান	প্রফেসর ড. সুলাইমান বিন হামাদ আল-আওদাহ
০৮	সহীহ আল্-কালিমুত্ তাইয়্যিব	শাইখ মুহাম্মদ নাসেরু-দ্-দীন আল-আলবানী
০৯	অভিভাষন	ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত জানুয়ারি ২০২৬ মাসের সালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	যোহর	'আসর	মাগরিব	'ইশা	তারিখ	ফজর	যোহর	'আসর	মাগরিব	'ইশা
০১.০১.২৬	০৫:২০	১২:০২	০৩:০৩	০৫:২৩	০৬:৪৪	১৬.০১.২৬	০৫:২৪	১২:০৮	০৩:১৩	০৫:৩৪	০৬:৫৩
০২.০১.২৬	০৫:২১	১২:০২	০৩:০৪	০৫:২৪	০৬:৪৪	১৭.০১.২৬	০৫:২৪	১২:০৯	০৩:১৩	০৫:৩৪	০৬:৫৪
০৩.০১.২৬	০৫:২১	১২:০৩	০৩:০৪	০৫:২৪	০৬:৪৫	১৮.০১.২৬	০৫:২৪	১২:০৯	০৩:১৪	০৫:৩৫	০৬:৫৪
০৪.০১.২৬	০৫:২১	১২:০৩	০৩:০৫	০৫:২৫	০৬:৪৫	১৯.০১.২৬	০৫:২৪	১২:০৯	০৩:১৫	০৫:৩৬	০৬:৫৫
০৫.০১.২৬	০৫:২২	১২:০৪	০৩:০৫	০৫:২৬	০৬:৪৬	২০.০১.২৬	০৫:২৪	১২:১০	০৩:১৫	০৫:৩৬	০৬:৫৫
০৬.০১.২৬	০৫:২২	১২:০৪	০৩:০৬	০৫:২৬	০৬:৪৭	২১.০১.২৬	০৫:২৪	১২:১০	০৩:১৬	০৫:৩৭	০৬:৫৬
০৭.০১.২৬	০৫:২২	১২:০৫	০৩:০৭	০৫:২৭	০৬:৪৭	২২.০১.২৬	০৫:২৪	১২:১০	০৩:১৭	০৫:৩৮	০৬:৫৭
০৮.০১.২৬	০৫:২৩	১২:০৫	০৩:০৭	০৫:২৮	০৬:৪৮	২৩.০১.২৬	০৫:২৪	১২:১০	০৩:১৭	০৫:৩৯	০৬:৫৭
০৯.০১.২৬	০৫:২৩	১২:০৬	০৩:০৮	০৫:২৯	০৬:৪৮	২৪.০১.২৬	০৫:২৩	১২:১১	০৩:১৮	০৫:৩৯	০৬:৫৮
১০.০১.২৬	০৫:২৩	১২:০৬	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৪৯	২৫.০১.২৬	০৫:২৩	১২:১১	০৩:১৮	০৫:৪০	০৬:৫৯
১১.০১.২৬	০৫:২৩	১২:০৬	০৩:০৯	০৫:৩০	০৬:৫০	২৬.০১.২৬	০৫:২৩	১২:১১	০৩:১৯	০৫:৪১	০৬:৫৯
১২.০১.২৬	০৫:২৩	১২:০৭	০৩:১০	০৫:৩১	০৬:৫০	২৭.০১.২৬	০৫:২৩	১২:১১	০৩:২০	০৫:৪১	০৭:০০
১৩.০১.২৬	০৫:২৩	১২:০৭	০৩:১১	০৫:৩১	০৬:৫১	২৮.০১.২৬	০৫:২৩	১২:১২	০৩:২০	০৫:৪২	০৭:০০
১৪.০১.২৬	০৫:২৪	১২:০৮	০৩:১১	০৫:৩২	০৬:৫২	২৯.০১.২৬	০৫:২৩	১২:১২	০৩:২১	০৫:৪৩	০৭:০১
১৫.০১.২৬	০৫:২৪	১২:০৮	০৩:১২	০৫:৩৩	০৬:৫২	৩০.০১.২৬	০৫:২২	১২:১২	০৩:২১	০৫:৪৪	০৭:০১
						৩১.০১.২৬	০৫:২২	১২:১২	০৩:২২	০৫:৪৪	০৭:০২

ঢাকার সময়ের আগে	সময়	ঢাকার সময়ের পরে
নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, পিরোজপুর	১ মিনিট	গাজীপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জ
চাঁদপুর, বরিশাল, বি.বাড়িয়া	২ মিনিট	ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ
সিলেট, হবিগঞ্জ	৩ মিনিট	টাংগাইল, সাতক্ষীরা
কুমিল্লা, মৌলভী বাজার	৪ মিনিট	যশোর, সিরাজগঞ্জ, রাজবাড়ী, শেরপুর, জামালপুর, ঝিনাইদহ
নোয়াখালী	৫ মিনিট	পাবনা, কুষ্টিয়া
ফেনী	৬ মিনিট	বগুড়া * ১০ মিনিটি পরে : চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সৈয়দপুর
	৭ মিনিট	গাইবান্ধা, নাটোর, মেহেরপুর, কুড়িগ্রাম
	৮ মিনিট	নওগাঁ, রাজশাহী * ১৩ মিনিট পরে : ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়
চট্টগ্রাম	৯ মিনিট	জয়পুরহাট, রংপুর, লালমনিরহাট
কক্সবাজার	১১ মিনিট	দিনাজপুর, নীলফামারী

সূর্যাস্তের সময় অনুসারে ঢাকার সময়ের সাথে কিশোরগঞ্জ ও বাগেরহাট

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER ATAB MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফটের ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদের ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk. **25.00**

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

IIUSTB

মেধাবৃত্তির সুবিধা

ভর্তি চলছে

Fall Semester 2025

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

৫০% টিউশন ফি ছাড়

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

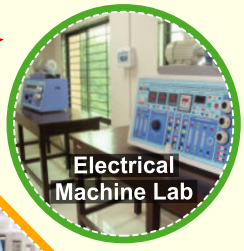

মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)
  Master of Business Administration (MBA-Regular)
  Master of Business Administration (MBA-Executive)

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

01329-728375-78 info@iiustb.ac.bd /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাস: বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত